জলের চেয়ে ঘন

প্রসাদ ভট্টাচার্য

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা—৬

জমিদারির দশ বারখানা গ্রামকে কবলিত করলেও, তাঁর প্রতাপ সমগ্র মহকুমাকেও স্পর্শ করত এবং সুদূরবিস্তৃত দিগন্তরেখাকেও প্রকম্পিত করত। এ কাহিনী সেই দিনের কাহিনী, যখন বাংলার শান্ত-শ্রী ছিল, শ্যামল শ্রী ছিল, বাংলা যখন জাগরিত ছিল—কিন্তু জাগরণের নামে ভেদাভেদ, উচ্ছেদের নামে রক্তাপ্লুত হয় নাই। নদীর তীরে যাদব চক্রবর্ত্তীর বিশাল অট্টালিকা—যার স্তরে স্তরে পূর্ব্ব পুরুষের কাহিনী বিজড়িত। বাড়িটি একতলা। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড পূজা-মণ্ডপ, মণ্ডপের এক পাশে বাবুর খাস-কামরা, অন্য পাশে সুসজ্জিত অতিথি-কামরা—সম্মুখে প্রকাণ্ড এবং চওড়া একটি বারান্দা। এইটি বাবুর বহির্মহল বা খাস-মহল। এই বহির্মহলের পশ্চাতে সামান্য দূরে তাঁর অন্দর-মহল—যেটি তাঁর পরিজনবর্গ, দাসদাসীতে সর্ব্বদা গুঞ্জরিত থাকে। চক্-মেলান দালান—তার দুদিকে দুই রাণীর নিজস্ব অংশ—তাঁদের নিজস্ব পৃথক ও বিচিত্র পৃথিবী। অন্যদিকে থাকেন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন—আশী বৎসর বয়স্কা মা থেকে আরম্ভ করে পনের বৎসর বয়স্কা শালার বালবিধবা কন্যা পর্য্যন্ত—সকলেই আছে। সকলেই সুখে আছে নিজের নিজের পৃথিবীতে। নিজের নিজের গণ্ডীর মধ্যে। বড়-রাণীর কোন সন্তান নাই। এবং নাই বলেই ছোট রাণীর আবির্ভাব বংশরক্ষার জন্য। ছোট রাণীর একমাত্র সন্তান—পুত্র নীলমাধব। নীলমাধব মা'কে চেনে না, চেনে তার বড়মা'কে। তার সমস্ত জিদ্, দাবী ও আবদার বড়মা'র কাছে—তার পৃথিবী বড়মাকে কেন্দ্র ক'রে। ছোটমাকে তখনই স্বীকার করে, যখন ছোট মা'র নামে নালিশ করতে হয় বড়মা'র কাছে। আট বছরের নীলমাধব এখনও বড়মা'র কাছেই শোয়। ছোটমা মাঝে মাঝে দিদির কাছে আবদার করেন যাতে নীলু এক আধ রাতও তার কাছে শোয়। বড়রাণী তাঁর কথা শুনে উত্তর দেন—"তোর মাথা খারাপ হয়েছে

ছোটবউ—ছেলে বড় হয়েছে, ওকে নিয়ে শুবি আর আজ যদি বাবু ভেতরে আসেন ?” একথার পর ছোট রাণীর বলবার কিছুই থাকে না। বাবু প্রায়ই এত্তেলা দিয়ে অন্দরে আসেন রাত্রি যাপনের জন্য। সে আসার কোন উপক্রমিকা নাই, কোন ভূমিকা নাই, কোন আবাহন সঙ্গীত নাই। অন্দরে আসার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাবুর খাস চাকর মথুর ছোট রাণীর খাস দাসী চন্নিকে খবরটা দিয়ে আসে। ছোট বউয়ের বিয়ের পর থেকে বড়রাণী তাঁর মহলে এই এত্তেলা দেওয়া বন্ধ করেছেন—বন্ধ করেছেন দু অধ্যায়ে, দুই রীতিতে। দ্বিতীয় বিবাহের পর বাবু নিজে বড়রাণীকে ডেকে তাঁর মহলে যাবার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু বড়রাণী বললেন—“তুমি পাগল হয়েছো ? এতে ছোট বৌ না আমাকে ভালবাসবে, না শ্রদ্ধা করবে—এ জিনিস ভাগাভাগি হয় না।” নীলমাধব মা'র দুধ ছাড়ার পর থেকেই বড়মার কাছে শোয়, সে অবস্থায় বড়রাণী বললেন—“ছোটবউ থাকবে কি নিয়ে ?” নীলমাধব বড় হবার পর তিনি বলেছেন—“ছেলে বড় হয়েছে না ?” এখন আর বাবু বড়রাণীর মহলে এত্তেলা দেন না। বড়রাণীই সংসারের কর্ত্রী, সিন্দুকের চাবি তাঁরই কাছে।

পূজামণ্ডপ থেকে লাল সুরকির একটা চওড়া পথ কিছু দূর চলে গেছে। তার প্রান্তে বহির্মহলের সঙ্গে সমান্তর রেখা টেনে কতকগুলি কামরা—যেখানে জমিদারের দপ্তর ও দারোয়ানদের থাকবার ঘর। সেটার ঠিক মাঝখানে একটি সিংহদ্বার—যার দুদিকে সেই কামরাগুলো। এই সিংহদ্বারে একজন দারোয়ান ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জ্ঞাপন করে যায়। সিংহদ্বার থেকে তার অন্তর দিয়ে সুরকির পথটি সোজা নদীর তীর পর্য্যন্ত চলে গেছে। নদীর তীরে তার সমাপ্তি হয়েছে আর একটি সুউচ্চ ফটকে। ফটকের সম্মুখে বাঁধান চত্বর, দুধারে বাঁধান বসার আসন। ধাপে ধাপে

সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জল পর্য্যন্ত। পূজামণ্ডপের সম্মুখের বারান্দায় বাবু তার আরাম-কেদারায় বসে থাকেন নদীর দিকে মুখ করে, তিনি নদীর জল পর্য্যন্ত দেখতে পান। বাবুকে দেখা যাক আর না যাক, নদীতে জেলেরা বা প্রজারা নৌকা নিয়ে যেতে যেতে যখন মণ্ডপের সম্মুখে আসত, তখন করজোড়ে·তাঁর উদ্দেশে একবার প্রণাম করত। ব্যাপারটা এখন গল্পের মত লাগলেও সত্য। পূজা-মণ্ডপের পিছনে একটা লম্বা ধরণের ঘর, যার একটিমাত্র লৌহ-দ্বার ভিতরের দিকে। তৈরী হবার পর তাতে আর সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করেনি। হিমশীতল ঘরখানার মেঝেতে সারি সারি করে কয়েকটা লোহার সিন্ধুক মাটিতে প্রোথিত। তার বুকে জমিদারের সঞ্চিত অর্থ, রাণীদের গহনা, পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া মণি-মাণিক্য! বহুদিনের বহু বিচিত্র ইতিহাস গোপন গহন কোণে রেখে সে ঘরটি একটি বিচিত্র আবহাওয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে আছে। সেটাই কোষাগার—লোকে বলে ঠাণ্ডা-ঘর।

ঠাণ্ডা-ঘরের লৌহ-ফটকের চাবি বাবুর পৈতায় ঝুলান এবং সিন্ধুকের চাবি বড়রাণীর আঁচলে—এই ব্যবস্থা বহু পুরাতন। ঘরের মেঝেতে প্রোথিত পাঁচটি লোহার সিন্ধুকের মধ্যে মধ্যেরটি প্রায় ছয় ফুট লম্বা। এতবড় সিন্ধুক সেখানে প্রোথিত করার কোন ইতিহাস স্বয়ং বাবুও জানেন না। সেটি শূন্য কিন্তু তারও চাবি বড়রাণীর কাছে। সেটির ইতিহাস ঠাণ্ডাঘরের চেয়েও রহস্যময়। রহস্যাবৃত চক্রবর্ত্তী বংশের রহস্যঘন বিষয়বস্তু ওটি। বাবুর আদেশে সেটিতে কিছু রাখা হয়না। এই ঘরটি যেমন চক্রবর্ত্তীবংশের কাছে রহস্যাবৃত, তেমনি নীলমাধবের কাছেও রহস্যাবৃত। সে কতবার তার ঠাকুমার কাছে এর ইতিহাস জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে, কিন্তু ঠাকুমা সে-প্রশ্নটির মনোমত উত্তর না দিয়ে অন্য

প্রসঙ্গের অবতারণা করে সেটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টা নীলমাধবের অন্তরের প্রশ্নকে বর্দ্ধিত ঔৎসুক্যে পরিণত করে রেখেছিল। এই ঠাণ্ডাঘরটি সমস্ত গ্রামের পরিচিত, প্রজাদের কাছে এটি একটি ভীতিপ্রদ স্থান। কোন প্রজাকে শাস্তি দিয়ে তাকে ভয় দেখান হত যে, ভবিষ্যতে তাকে ঠাণ্ডাঘরে বন্ধ করে রাখা হবে। রাখা অবশ্য কাউকে হয়নি কিন্তু এ ধমকে বহু প্রজাকে তার শাস্তির শেষ অধ্যায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দিনে দিনে কথায় কথায় এই ভীতি প্রজাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। ঠাণ্ডাঘর বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে বিভিন্ন ইতিহাস নিয়ে জাগরিত।

প্রত্যূষ থেকে রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জমিদার বাড়ী সরগরম থাকে। অতিভোরে বাড়ীর দাসদাসীরা উঠে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। মহল পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কার্য্যের ব্যস্ততা। নিজের নিজের কাজের মধ্যে অন্যের কাজের দোষ ধরা। বাইরের দপ্তর মহলে কর্ম্মচারীরা নিজের নিজের দপ্তরে এসে বসে। ম্যানেজার আসে কিছু দেরীতে, তাঁর সঙ্গে আসে কিছু প্রজা। আসার পথে আরও প্রজারা এসে তাঁকে ঘিরে থাকে। নানাপ্রকারের অনুনয় বিনয়, উত্তরে বিভিন্ন প্রকারের ভর্ৎসনা, সময়ানুযায়ী বিচিত্র স্বরের উত্তর। পেট-কাটা কুঠরির কাছে প্রহরী বদল হয়। সে সময় নতুন প্রহরী স্নান সেরে, কপালে তিলক লাগিয়ে সীতারাম সীতারাম ধ্বনি করতে করতে রাত্রির প্রহরীর কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে তার তৈলচিক্কণ টুলটার উপর বসে পড়ে। রাত্রের প্রহরী একটি লোটা নিয়ে নদীর দিকে চলে যায়। জমিদার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করেন। প্রাতঃকৃত্যের সমাপ্তির পর তাঁর খাশ চাকর একটি নিমের দাঁতন হাতে ধরিয়ে দেয়, তিনি সেটি চিবতে চিবতে নগ্নপদে সম্মুখের মাঠে

পায়চারি করে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলাতে থাকেন। যতক্ষণ মালিক প্রাতঃভ্রমণ করেন, রাত্রির প্রহরী কাঁধে বন্দুক নিয়ে পেট-কাটা কুঠরির সম্মুখে সমস্ত দপ্তরখানাটিকে প্রদক্ষিণ করে নিজের কর্ম্ম-কুশলতা দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ততক্ষণ তাঁর খাস চাকর বারান্দার উপর মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। বাবু বারন্দায় বসে মুখ ধুতে থাকেন, ভৃত্য তোয়ালে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। মুখ ধোওয়ার পর জমিদার বারন্দায় নিজের আরাম কেদারায় দেহটিকে এলিয়ে দেন। ভৃত্য মথুর প্রভুর জন্য ত্রিফলা ভিজান জল একটি ছোট পাথরের গেলাসে এনে সামনে ধরে। বাবু সেটি অবিকৃত মুখে পান করবার পর মথুর গড়গড়ার নলটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। জমিদারের দৃষ্টি চলতে থাকে দিনের কার্য্যাবলীর স্রোতে! এ স্রোত বংশপরম্পরায় চলে আসছে জমিদারের দৃষ্টির সম্মুখে। কে জানে, এ স্রোত কতদিন চলবে। এ চিন্তাটিও যাদব চক্রবর্ত্তীর মনে প্রায়ই উদয় হয়ে কপালের উপর কয়েকটি সুস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত করে দেয়। পেট-কাটা কুঠরির ভিতর থেকে নবগঙ্গার কিয়দংশ দেখা যায়। দেখা যায় অবিরাম স্রোত এবং তার বুকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকার সারি। পেট-কাটা ঘরের পিছনের সুদীর্ঘ ঝাউ গাছটির মাথার তৈলচিক্কণ পাতাগুলো নবগঙ্গার বুকের হাওয়ায় দুলতে থাকে। তার মাথায় একটি চিল নদীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে গৃধ্রের মত বসে আছে। এই ঝাউ গাছটি যেন চক্রবর্ত্তী বংশের প্রতীক। এত উঁচু গাছ সচারচর চোখে পড়ে না। নদীর আকৃতির জন্যই হোক বা গাছটির উচ্চতার জন্যই হোক এর মাথাটি চার মাইল দূরবর্ত্তী বাঁকাড়া গ্রাম থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। নৌকার যাত্রীরা সেখানে এসে গাছটি দেখিয়ে বলে—“ঐ বাবুর বাড়ীর ঝাউ দেখা যাচ্ছে, আর বেশী দেরী নাই—।” কত ঝড়, কত জল, কত তুফান এই গাছটি সহ্য করেছে। রক্ষা করেছে জমিদার বাড়ীর দপ্তর-

মহল ও বহির্মহলকে। গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত নির্জীব গ্রামকে জাগরিত রাখে এই ঝাউ। তার মাথায় মাথায় পাতার একটি অদ্ভুত শব্দ হয় "শন্ শন্ শন্"। সে শব্দ সারা গ্রামের ঘর থেকে শোনা যায়। শুষ্ক তপ্ত মাঠের বুকে সেটা একটা বিচিত্র সঙ্গীত বলে মনে হয়। তার শব্দে যেমন একটা সুশ্রাব্য সঙ্গীত আছে, তেমনি যেন একটা ভীতিও আছে। অপরাহ্ণের প্রথম স্পর্শে সে শব্দ বন্ধ হয়ে যায়—লোকে বলে, "ঝাউ থেমেছে, বিকেল হল।" এটা সত্যই অদ্ভুত। সমস্ত রাত্রি সেটা নিশ্চল হয়ে যেন সমস্ত চক্রবর্ত্তী বংশকে পাহারা দেয়।

সেদিন সকালেও জমিদার নিজের আরামকেদারায় বসে ঝাউ গাছটির মাথার দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করছিলেন। সম্মুখে সীতানাথ মাঝি এসে আভূমি প্রণাম করল। বাবুর খড়মটিকে স্পর্শ করে নিজের জিহ্বায় ও মাথায় ঠেকালে।

"এই যে সীতেনাথ—তোর কথাই ভাবছিলাম।" জমিদার এর পূর্ব্বে ঝাউএর মাথার দিকে তাকিয়ে সীতানাথের কথা চিন্তা করছিলেন কিনা সেকথাও চিন্তনীয়।

"এজ্ঞে—হুকুম হোক।"

"ত্যাখ, আজ দুদিন থেকে বড় মুড়িঘণ্ট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—একটা বড় রুই এনে দে দেখি—"

"এজ্ঞে, এখনি এনে দিচ্ছি।" সম্মুখের নবগঙ্গার পাঁচ মাইল দূর পর্য্যন্ত জলস্বত্ব ও মাছের মালিক যাদব চক্রবর্ত্তী। এ স্বত্বের জন্য তাঁর পিতামহ বিলাত পর্য্যন্ত দেওয়ানী মকর্দ্দমা লড়েন এবং জয়লাভ করেন। সীতানাথ মাছের ইজারাদার। জমিদার বাড়ীর প্রতিদিনের মাছ সেই যোগায়। প্রতিদিন ফিরে যাবার সময় বাবুর পদধূলি নিয়ে যায়। কখনো কখনো বাবুর এমনি অদ্ভুত আদেশ হয়। "মথরো, অন্দরে খবর দে যে, সীতেনাথ যে মাছটা দেবে তার

মাথা দিয়ে সোনামুগের ডালের মুড়িঘণ্ট হবে আজ। আর দেখ, ঠাকুরমশায়ের বাড়ীশুদ্ধ আজ নেমন্তন্ন করে পাঠাতে বল।" বাবুর এপ্রকার আদেশ মথুরার কাছে নতুন নয়। এতক্ষণ যাদব চক্রবর্ত্তী কি ঝাউ গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে মুড়িঘণ্টের কথা ভাবছিলেন? তার চিন্তার জালকে কুণ্ডলী পাকিয়ে দিচ্ছিল গড়গড়ায় বৃত্তাকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চিন্তার অপস্রিয়মান ধারা কোন স্থানে স্থিতি পেয়ে দানা বাঁধতে পারছিল না—গড়গড়ার ধোঁয়া তাকে আরো ক্ষণশীল করে তুলছিল। সীতানাথকে সম্মুখে দেখে যাদব চক্রবর্ত্তী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। হঠাৎ তার মনে হল সোনা-মুগের দানা দিয়ে মুড়িঘণ্ট খাবার। মুড়িঘণ্ট সমস্যা সমাধানের পরই জমিদারির ম্যানেজার তাফু মিঞা এসে করজোড়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। বাবুর আবার অবসর হল চিন্তার হাতে নিজেকে মরণাপন্ন অবস্থায় ছেড়ে না দেওয়ার।

"কী খবর কাকা—? বসুন!"

"জমিদারের আদেশে তাফু মিঞা অদূরের জল-চৌকির উপরে বসে পড়লেন। জমিদারের সামনে একটা জলচৌকি পাতা থাকে। তিনি যাকে বসতে বলেন সেই বসে, অন্যথা দাঁড়িয়েই কথা বলে। কর্ম্মচারীদের মধ্যে তিনি একমাত্র তাফু মিঞাকেই বসতে বলেন। এই তাফু মিঞা যাদব চক্রবর্ত্তীর পিতার আমলের ম্যানেজার। সেই সম্পর্কে বর্ত্তমান মালিক তাঁকে বাবা বলে ডাকেন এবং তদ্রূপ সম্মানও দেন। তাফু মিঞা চক্রবর্ত্তী বংশের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী। এ বংশের শুভাশুভের চিন্তাতেই তাঁর এই দীর্ঘ জীবন কাটল। পনের বৎসর বয়সে তিনি এ বংশের দ্বারস্থ হন। আজ তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। যাদব চক্রবর্ত্তীর পিতা মৃত্যুর সময়ে তাঁর জমিদারি ও পুত্রকে তাফু মিঞার হাতে সঁপে দিয়ে যান। সে সমর্পণের অবমাননা

আজ পর্য্যন্ত তাফু মিঞা করে নাই। বর্ত্তমান জমিদার তাঁর ম্যানেজারকে যেমন সম্মান দেখান, তেমনি প্রয়োজনমতো শাসনের রক্তচক্ষুও দেখান। জমিদারীর কার্য্যচালনার ব্যাপারে তিনি কাহারও সম্মুখে সিংহ-গর্জ্জন করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন না। তাফু মিঞা পুরাতন মালিক-পুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন কিন্তু বর্ত্তমান মালিককে তাঁর প্রাপ্য সম্পূর্ণ সম্মান দেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। যাদব চক্রবর্ত্তীর জমিদারীর জন্য তাফু মিঞার চেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী যাদব চক্রবর্ত্তী নিজেও নন। আভূমি প্রণিপাত করে তাফু মিঞা জলচৌকির উপর সসঙ্কোচে বসেন।

"খবর সব ভাল তো কাকা?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। খোদার মেহেরবানিতে সবই ভাল। দু'জন পেরজাকে নিয়ে বড়ই বিপদ হয়েছে, হুজুর—!"

"বিপদ! প্রজাকে নিয়ে বিপদ!" জমিদারের কপাল কুঞ্চিত হল—গড়গড়ায় টান দ্রুত হয়ে গেল।

"কে তারা?"

"আজ্ঞে, ছিদেম মুচি, আর ইমদু মিঞা—কেউই খাজনা দিতে চায় না—।"

"চায় না! মানে?"—জমিদার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন।

"আজ্ঞে, দু'জনের চায়নাতে একটু তফাৎ আছে। ছিদেমের বৌটা সেদিন ম'ল। ওর মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে, সে একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ল।"

"ও, সেই ছিদেম! বেচারার বড় দুর্দ্দিন কাকা, ওর খাজনাটা আপনি মাফ করে দিন। ক'বছরের বাকী?"

"সাত বছরের।"

"তা হোক সবটাই মাফ করে দিন। আর ওর মেয়ের বিয়ের

জন্যে শ'খানেক টাকা বরং ওকে দিয়ে দিন। আপনার কী মত?" জমিদারের গড়গড়ার টান ধীর ও যেন ছন্দোবদ্ধ হল।

"আজ্ঞে, আপনি দয়ার সাগর। আমিও এমনি ভাবছিলাম, তবে নগদ টাকাটা দেওয়া—

"তা হোক কাকা—ওদেরকে না দিলে ওরা পাবে কোথায়! ইমদুরও কী সেই অবস্থা?"

"আজ্ঞে না হুজুর, ইমদু একজন বড় প্রজা, ওর অবস্থা বেশ ভাল। ওকে কে যেন আইন বুঝিয়েছে, বলছে চার বছরের বেশী বাকি খাজনা দেব না, আর চার বছরের তামাদি হয়েছে।"

"তামাদি—! আইন দেখাচ্ছে আমাকে! সেবার ওর সেই বিপদের জন্যই খাজনা চাওয়া হয় নি, আজ বলে তামাদি হয়েছে? আপনি কিছু বুঝিয়েছিলেন?"

"অনেক বুঝিয়েছি কর্ত্তা। বেশী বলতে সাহস হল না, কথা-গুলো বড় কড়া কড়া বলে। এই বয়েসে—"

বেশী শুনবার ধৈর্য্য আর যাদব চক্রবর্ত্তীর ছিল না। তাফু-মিঞার অপমানের কোন ইঙ্গিত পেলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কোন কোন সময় তিনি নিজের অপমান সহ্য করতে পারেন কিন্তু ম্যানেজারের অপমানকে তিনি তাঁর জমিদারীর অপমান মনে করেন। মনে করেন, তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এই সৌধভিত্তির মূলে কে যেন সজোরে কুঠারাঘাত করবার চেষ্টা করছে। তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাফু মিঞা মালিকের এ স্বভাব জানেন, তাই সাধারণতঃ এ সব বিষয় তিনি নিজেই সমাধান করবার চেষ্টা করেন। যখন তার শক্তির বাহিরে চলে যায়, তখন বাধ্য হয়ে কর্ত্তার কানে আনেন।

"কোই হ্যায়—!" যাদব চক্রবর্ত্তীর গর্জ্জন অদূরের পেট-কাটা ঘরের বুকে একটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসে। মহলের সিপাহী

রামসিং তখন পেট-কাটা ঘরের অপর পার্শ্বে সমস্ত গায়ে মাটি মেখে নিজের দৈনন্দিন ব্যায়াম চর্চ্চা করছিল, সে সেই অবস্থায় কোমরে একটা গামছা জড়িয়ে ছুটে এল।

"রামসিং! ইমতুকে এখুনি আমার সামনে হাজির কর, স্বেচ্ছায় আসতে না চায় বেঁধে আনবে।"

"তুরন্ত্ হুজুর—" রামসিং সেলাম দিয়ে উত্তর দিল। ইমতুর ওপর রামসিং-এরও রাগ ছিল। রাগের কারণ অবশ্য জমিদারের খাজনা না দেওয়ার জন্য নয়, তার মাসিক সেলামী ভাতা বন্ধ করে দেবার জন্য। রামসিং প্রভুভক্ত ও নিজ-ভক্ত। সে তার মালিকের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, কিন্তু বিসর্জ্জন না দেওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রাণটুকু সতেজ রাখবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে। সুদূর সাহাবাদ জিলার বক্সার মহকুমা থেকে সে এই পল্লীগ্রামে এসেছে চাকরী করতে। এই নরম পানীতে জান বাঁচাবার জন্য সে মূলমন্ত্র করেছে দুটি—প্রতিদিন ব্যায়াম ও সিদ্ধি। আপ্রাণ অর্থ সঞ্চয় ও শেষ সিদ্ধি! রামসিং কালক্ষেপ না করে ধূলি-ধূসরিত দেহেই তার তৈল-চিক্কণ লাঠিটি নিয়ে ইমতুর বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে গেল। আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাফু মিঞা ত্রস্তপদে নিজের দপ্তরে গিয়ে বসলেন। যাদব চক্রবর্ত্তীর গড়গড়ার উপর তার চাকর কলকেটি পালটিয়ে দিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রামসিং ও তিনজন অন্য সিপাই ইমতুকে রীতিমত চোরের মত বেঁধে নিয়ে কর্ত্তার সম্মুখে এনে উপস্থিত করল। যাদব চক্রবর্ত্তী প্রজার সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না—এমন আবহাওয়ায় প্রজার দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করেন না। "ধানমাড়াইয়ের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখ—সব টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়বে না, ম্যানেজার বাবুকে বলে দাও।

হ্যাঁ, দেখ রামসিং—ওর খাওয়ার ও জলের যেন কোন কষ্ট না হয়—যাও।”

মহলের পিছনে অনেকটা জায়গার বুকে একটা বাঁশ পোঁতা আছে, তাতে বলদ বেঁধে ধান মাড়াই করা হয়। স্থানটির চতুর্দ্দিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ধানের সময় সে জায়গায় স্তূপীকৃত কাটা ও মাড়াই করা ধান দেখিতে পাওয়া যায়। পরে সেগুলিকে ধীরে ধীরে গোলায় ভরে ফেলা হয়। কোন প্রজাকে কঠিন শাস্তি দিতে হলে জমিদার আদেশ করেন, তাকে সেই খুঁটির সঙ্গে রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে বেঁধে রাখতে। ইমদুরও সেই আদেশ হল। বৈশাখের কাঠ-ফাটা রোদ, বেলা এগারটার সময়ই মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবী ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করছে। নবগঙ্গার বুকের ওপর কেমন যেন একটা স্তব্ধ ভাব। মাঠের নির্জ্জন বুকে মরীচিকার আবির্ভাব। ঝাউ গাছটির পাতায় পাতায় একটি বিশ্রী শোঁ শোঁ শব্দ। পেট-কাটা ঘরের কার্নিশে পায়রার দল তাদের ডাকে আবহাওয়াটাকে যেন আরো গম্ভীর করে তুলেছে। ধানমাড়াইয়ের জায়গার পিছন দিয়ে একটা খিড়কির দরজা আছে, সেটা দিয়ে বের হয়ে গিয়ে কায়েত-পাড়ার পথ ধরা যায়। নীলমাধব রোজ এই পথে স্কুলে যাতায়াত করে। এই পথে গেলে স্কুলের একটা সোজা পথ ধরা যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা—এই পথে গেলে পিতার দৃষ্টিকেও এড়িয়ে যাওয়া যায়। জমিদারের সম্মুখ-দৃষ্টিকে ভয় বালক নীলমাধবও করে। সেইদিন প্রাতঃকালীন স্কুলের ছুটির পর নীলু দেখল, ইমদু সেই বাঁশের সঙ্গে বাঁধা—এমন করে বাঁধা, যেন সে একজন দাগীচোর।

“ইমদু তুমি এভাবে—?” নীলমাধব হতবাক হয়ে গেল! লজ্জায় অপমানে ইমদু মিঞা কোন উত্তর দিতে পারল না। এর চেয়ে যেন তার মৃত্যুও ভাল ছিল। নীলুকে ইমদু বড় ভালবাসত,

তাকে প্রায় সব প্রজাই স্নেহ করত, বলত সে নাকি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! "দাঁড়াও, তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি।"

"রাজাবাবু—অমন কাজও করো না, তাহলে তোমার দশাও আমার মত হবে—কর্ত্তাকে ত তুমি জান।"

সত্যই সে জানে। নীলমাধবের উৎসাহ এক ফুৎকারে যেন নিভে গেল। সে তার বই নিয়েই ছুটে গেল বড়মা'র কাছে। কেঁদে জড়িয়ে ধরল বড়মাকে। "কি হয়েছে, মাস্টার মেরেছে বুঝি?" বহু চেষ্টার পর বড়রাণী নীলুর কান্নার কারণ জানতে পারলেন। কিন্তু তিনিও নিরুপায়।

"তুমি ওকে খুলে দেবার হুকুম দিয়ে দাও বড়মা।"

"সে হয় না বাবা—কর্ত্তার হুকুমের ওপর এ বাড়ীর কারোর হুকুম চলবে না—আর উচিতও নয়। জমিদারীর ব্যাপারে তিনিই শেষ কথা।"

"এ কেমন জমিদারী, বড়-মা? লোকটা যে ম'রে যাবে।" এর উত্তর বড়রাণীও দিতে পারলেন না। এ কেমন জমিদারী তা তিনিও জানেন না, তবে এ জমিদারী তাঁরও সহ্য হয়ে গেছে—সহ্য হয়ে গেছে প্রথম দিন থেকে দেখতে দেখতে। তাঁর প্রকৃত সত্বাকে মেরে ফেলে এ আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যাদব চক্রবর্ত্তীর বড়বৌ হতে পেরেছিলেন। ইমদু মিঞার স্ত্রী জমিদারের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে স্বামীর মুক্তি বেলা দেড়টার সময় ভিক্ষা করে নিয়েছিল। ইমদু গরীব নয়, ইমদু মৃত নয়, তাই সে এ অপমান ভুলতে পারে নি কোনদিন। ভারতবর্ষে যাদব চক্রবর্ত্তীরা এমনভাবে যে অঙ্কুর বপন করেছিলেন, ভবিষ্যতে সেই অঙ্কুরই মহীরুহরূপে জাগ্রত হয়েছিল। যাদব চক্রবর্ত্তীদের কর্ম্মপন্থার জন্যই দেশে শত শত ইমদুর আবির্ভাব হয়েছিল, ঘরে ঘরে নীলমাধবের জন্ম হয়েছিল। এসব আবির্ভাবের

জন্য ভারতের রাজনৈতিক আকাশ দায়ী নয়—পৃথিবীর কোন দেশের ব্যাধির সংক্রামক স্পর্শও নয়। সেদিনের ইতিহাস ইমতুও ভুলতে পারলেন না—নীলমাধবও ভুলতে পারল না। দু'জনেই মনে রাখল সে কাহিনীকে দু'ভাবে। দু'জনেই ভবিষ্যৎ অঙ্কন করল বিভিন্ন লেখনীতে। দু'জনের মনেই গভীর দাগ কেটে গেল কিন্তু বিভিন্ন স্তরে। কে সঠিক পথ ধরল জানি না। কারণ যাদব চক্রবর্ত্তীরা যেমন ইমতুরের শাস্তি দিয়েছে, তেমনি ছিদাম মুচির কন্যাদায়ও উদ্ধার করেছে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে ঠিক, কিন্তু সোনাকে খাঁটি করবার শক্তিও আছে তার। অগ্নি জ্বালাতেও পারে, প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রও সে গড়তে পারে। সে ধ্বংস করে, কিন্তু তার অন্তরে সৃষ্টি করবার শক্তিও আছে। কল্কি যেমন অগ্নি, সৃষ্টিকর্ত্তাও তেমনি অগ্নি। তার দেহ স্পর্শে যেমন দহন করে, তেমনি তার লেলিহান শিখা পবিত্রও করে।

ইমতুর ব্যাপার নীলমাধবের মনে অনেকদিন ধরে যেন সমুদ্র-মন্থন করল। রাত্রিদিন যে মন্থন তার মনে চলল, তাতে অমৃত কী হলাহল উঠল জানি না—তবে কয়েকদিনের সে মন্থন তার অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করে দিল। নীলমাধব শান্ত হতে পারল না—কে যেন তাকে শান্ত হতে দিল না। রাত্রে বড়মার কাছে শুয়ে আর একদিন সে ইমতুর অধ্যায়ের পুনরুত্থাপন করেছিল।

"বড়-মা, তুমি বাবাকে বল এমন কষ্ট লোককে আর না দিতে—বেচারার সেদিন কত কষ্ট হয়েছিল ভাব ত!" বড়রাণী পুত্রকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে অন্তরের সঙ্গে চেপে ধরলেন। তাঁর বুকে কিসের যেন একটা শান্তির বাণী শুনতে পেলেন। ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে কোথায় যেন একটা বিদ্যুৎচ্ছটা দেখতে পেলেন। নীলমাধবের মধ্যে তিনি যেন প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন। তবুও তিনি পুত্রকে দুর্ব্বলতার

পরিচয় দিতে রাজি নন। তিনি চান না যে, নীলমাধব দুর্ব্বল জমিদার হয়ে এই জমিদারীতে কোথাও একটু চিড় খাওয়াতে পারে।

"বাবা, জমিদারী চালাতে হলে চার নীতি যোগাতে হয় শুনেছি। এটাও একটা নীতি, সময় সময় এরও দরকার, নয়ত জমিদারী চলে না।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না বড়-মা।

আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে বাবা!"

নীলমাধব একথার উত্তর দিতে পারল না। যে কথা সে এখন বুঝতে পারছে না, যে কথা তার অন্তর এখন বুঝতে চাচ্ছে না, সে-কথা সে কী বড় হয়ে বুঝতে পারবে? হয়ত পারবে, নয়ত পারবে না। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বড়-মাকে আরো আঁকড়ে ধরে ঘুমাবার চেষ্টা করল। এ চেষ্টা ঘুমাবার নয় যেন, এ চেষ্টা যেন কোথাও আশ্রয় পাবার আকুলি বিকুলি। নীলমাধব ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু বড়রাণী বহুক্ষণ ঘুমাতে পারলেন না। তাঁর মাথায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

পরদিন নীলু জিদ ধরল যে, সে ছোট-মার কাছে একরাত্রি শোবে। এমন ইচ্ছা সে মাঝে মাঝে প্রকাশ করত। ছোট রাণী বাধা দিতেন, বড়রাণী তাকে বুঝিয়ে বলতেন—"মাঝে মাঝে ওকে তোমার কাছে শুতে দিও ছোটবৌ, নয়তো মা'র ওপর ছেলের টান পড়বে না।"

"ও তো তোমারই ছেলে দিদি। এমন করলে তোমার ওপর ওর টান কমে যাবে।"

"তা যাক—আমার ওপর টান কমলে ক্ষতি নেই। তোমার ওপর যেন না কমে, ছেলে ত তোমারই—"

"এটা ওকে যেন বুঝতে দিও না—তুমিও মনে এনো না দিদি।"

বড়রাণী ছোট রাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—"আচ্ছা রে আচ্ছা, তা দেব না। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর বোধ হয় মা বদলাতে সখ হয়, ওতে বাধা দিস নে।" সেদিনও নীলু সেই সখ প্রকাশ করল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়রাণী চন্নিকে ডেকে নীলমাধবের বিছানা ছোট রাণীর ঘরে করে দিতে বললেন। হুকুম পেয়ে চন্নি যেন একটু বিচলিত হ'ল, তার মুখ দেখে বড়রাণী একটা যেন প্রতিবাদের আভাস পেলেন।

"কী রে, কিছু বলবি ?"

"রাণীমা !—"

"কী বলবি বলনা চন্নি—আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"আজ বাবু হুকুম পাঠিয়েছেন যে—"

"ওঃ, বুঝেছি। বাবু কোথায় আছেন এখন ?"

"বাইরের বারান্দায়।"

"খবর দে একটু, আমি তার খাস কামরায় যাচ্ছি।"

চন্নি গিয়ে মথুরকে খবর দিল, মথুর তার মালিককে নিবেদন করে এল। সে বাড়ীর ঝিরও হুকুম ছিল না বাইরে যাবার সদর রাস্তা দিয়ে। সে জমিদার বাড়ীর ঝি, তার পর্দ্দাও জমিদার বাড়ীর পর্দ্দা। যাদব চক্রবর্ত্তী আরাম কেদারায় বসে গড়গড়া টানছিলেন, এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতাল ভেবে যাচ্ছিলেন। ভেবে যাচ্ছিলেন অতীতের কথা, ধরবার চেষ্টা করছিলেন ভবিষ্যতের ছবিটাকে। সম্মুখের আকাশে মেঘগুলো যেন হাল্কা হয়ে কোন দিকে উড়ে যাচ্ছিল। মথুরের হাত কচলান নিবেদন শুনে তিনি একটু আশ্চর্য্য হলেন—হঠাৎ এসময় বড়রাণীর খবর ? মথুর চটিটা পায়ে পরিয়ে দিল, জমিদার কোঁচার খুঁটটি হাতে ধরে এগিয়ে চললেন খাস কামরার দিকে। পিছনে মথুর গড়গড়াটি নিয়ে চলল। খাস কামরায় গিয়ে দেখেন, বড়বৌ একটা চেয়ারে বসে

আছেন। জমিদারকে দেখে তিনি সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন—এ রীতির ব্যতিক্রম জমিদার পত্নীতেও হবার উপায় ছিল না। যাদব চক্রবর্ত্তী তার উঁচু বিছানায় দেহ এলিয়ে দিলেন, মথুর হাতে নলটি ধরিয়ে দিয়ে পিছনের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে সম্মুখের দরজায় পাহারা দিতে থাকল। রাজায় রানীতে সাক্ষাৎ। তার মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা মাথুর জানে।

"কী বড়বৌ, হঠাৎ অধীনকে তলব?"

জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তী শুষ্ক নয়। তাঁরও রস আছে। বড়রাণী স্বামীর পায়ের কাছে বসে তার পদসেবা আরম্ভ করে দিলেন।

"তুমি আজ ছোটবৌ-এর ঘরে এত্তেলা পাঠিয়েছ?"

"হ্যাঁ,—কেন বল দেখি?"

"আজ নীলু তার মার কাছে শোবে?"

"তা হলে ত সে তোমার কাছেই শোবে! এই ত তার মানে হল।" স্বামীর কথা শুনে বড়রাণী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

"না, না—আমার বলতে ভুল হয়েছে। সে ছোট বৌএর কাছে শোবে আজ—তার ইচ্ছে হয়েছে।"

"দেখ বড়বৌ, এ ভুল যেন বেশী না হয়, তাহলে নীলুর ভবিষ্যতও ভুল হয়ে যাবে। সে যেন কখনো না জানে যে, তুমি তার সৎমা! যাক, তাহলে এ এত্তেলা বাতিল করে দাও।" একটু হেসে জমিদার বললেন—"চন্নিকে দিয়ে তোমার মহলে এত্তেলা পাঠাচ্ছি—"

বড়রাণী চমকে উঠলেন। জমিদার কী তার কথা এই অছিলা মনে করলেন? আবহাওয়াটাকে তরল করবার চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন—

"আয়নায় দেখ, গোঁফে যেন দু-একটা পাক ধরেছে—এসব আবার কী সখ?"

"ওটা বয়েসের পাক নয় বড় বৌ, ওটা ধোঁয়ায় পেকেছে। তুমি গোঁফ দেখছ কিন্তু অন্তরটা দেখ।"

"নজর প্রথমে গোঁফেই পড়ে—অন্তর পরে আসে। আমি চল্লাম, অনেক কাজ আছে। চন্নিকে মানা করে দেব ?"

"দাও—" জমিদারের উদাস উত্তর।

বড়রাণী চলে যাবার পর যাদব চক্রবর্ত্তীকে কে যেন চাবুক মেরে উঠিয়ে দিল। গড়গড়ার নলটি মাটিতে পড়ে গেল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত দেওয়ালে টাঙ্গান আয়নার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আপাদ-মস্তক দেখা যায় সে দর্পণে। কিন্তু জমিদার প্রথম বাধা পেলেন তার উপরকার পুঁতিবসান ঝালর দেওয়া মূল্যবান আবরণে। যাদব চক্রবর্ত্তী একটানে সেটাকে দূরে ফেলে দিলেন। কৃত্রিম পুঁতিগুলো কঠিন মেঝের উপর সামান্য শব্দ করে উঠল। যাদব চক্রবর্ত্তী ঘরের ঝাড় বাতিতে নিজের সমস্ত শরীর দর্পণে দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন তাঁর আপাদ মস্তক—দেখতে পেলেন কেশাগ্র থেকে পায়ের নখর পর্য্যন্ত। তিনি দর্পণের খুব কাছে সরে গেলেন। এই কি তাঁর চেহারা ? তিনি যেন বহুদিন পর নিজের চেহারা দেখলেন, দেখে চমকে উঠলেন। এ কী ? চেহারায় যেন পরিবর্ত্তন হতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যেন ভাঙ্গনের ইঙ্গিত দিয়েছে। জলোচ্ছ্বাস বর্ষার নদীতে মাঝে মাঝে যেন চরের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, কূলের কোলে কোলে যেন জলের টান ধরেছে। বর্ষার পূর্ণতার, উচ্ছলতার শুধু একটা যেন চিহ্ন পড়ে আছে, কিন্তু জল কমতে আরম্ভ করেছে। স্রোত এখনো আছে কিন্তু তার উদ্দামতা কমে এসেছে। জমিদার তীক্ষ্ণভাবে নিজের পুষ্ট গোঁফ দেখতে লাগলেন—হ্যাঁ, একটা পক্ব কেশ তাতে দেখা যাচ্ছে বটে। তাড়াতাড়ি তিনি সেটাকে তুলে ফেললেন, যেন কেউ দেখতে না পায়। এ কী, আর একটা! সেটাও তুলে ফেললেন। এ কী

আর একটা। যাদব চক্রবর্ত্তী পাগলের মত ছুটে এসে আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লেন। "মথুর—!" তাঁর কাতর কণ্ঠস্বর।

"এজ্ঞে—" মথুর ক্ষিপ্রগতিতে মনিবের কাছে উপস্থিত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনিবের মুখে যেন একটা আতঙ্কের ছাপ।

"মথুব, সিধু নাপিতকে এখুনি আসতে বল। তাকে তার আওজার নিয়ে আসতে বলবি! যা, শিগ্‌গির যা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না হারামজাদা!" মথুর ছুটে বেরিয়ে গেল। সিধু আসলে জমিদার নিজের যত্নে প্রতিপালিত গোঁফটিকে নির্মূল করে কামিয়ে নিলেন। কামাবার পর আবার গিয়ে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়ালেন, দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে যাদব চক্রবর্ত্তীর মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। কাকে যেন তিনি ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছেন।"

"মথুর!—"

"এজ্ঞে—"

"খাজাঞ্চীবাবুকে বল, সিধুকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেবে এক্ষুনি। যা তোরা!"

যাদব চক্রবর্ত্তী আবার এসে ইজিচেয়ারে নিজের দেহ এলিয়ে দিলেন, হাতে তুলে নিলেন গড়গড়ার নলটি, টানতে লাগলেন তৃপ্তির সঙ্গে। আগুন অনেকক্ষণ নিভে গেছে কিন্তু সেদিকে জমিদারের হুঁস নাই। তিনি তৃপ্তির সঙ্গে টেনেই চলেছেন, সে টানে না আগুন জ্বলছে, না ধোঁয়া বের হচ্ছে। আবার যেন তিনি নদীতে জল-কলোচ্ছ্বাস শুনতে পেলেন, আবার যেন শুনতে পেলেন বন্যার ডাক, অনুভব করলেন স্রোতের টান, হাওয়ার টান। "মথুর—!"

মথুর নিঃশব্দে এসে কলকেটি পালটে দিল।

"বাবু—" বাবুর মেজাজ খুশী দেখলে, মথুর জমিদারকে বাবু বলে সম্বোধন করে, অন্য সময় বলে হুজুর।
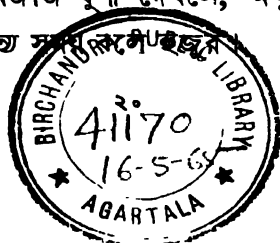
"মথুর, এ ঘরে ফরাশ বেছা—আলমারী খুলে দে, আর শশাঙ্ককে খবর দে।" বাবুর এ হুকুমের অর্থ মথুর জানে। জানে তার পরের পরিচ্ছেদগুলোও। সে ইতস্তত করতে লাগল। "কী ভাবচিস হারামজাদা—চাবুকের জন্য পিটটা নিসপিস করছে, না? আজ যদি হিতোপদেশ শুনিয়েছ তবে পিঠের এক পর্দ্দা চামড়া উঠে যাবে জেনে রেখ। যা বললাম, তাই কর। আর ভিতরে বলে দে, আমাদের দু'জনের খাবার আজ এই ঘরে আসবে—যা জলদি।"

জমিদার আবার বসে গড়গড়ায় টান দিলেন। এবার আগুণ জ্বলছে, তার স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে।

শশাঙ্ক রায় জমিদারের বন্ধু, সুখদুঃখের বন্ধু নয়, শুধু সুখের বন্ধু। নিঃসন্তান শশাঙ্ক রায় শুধু স্বামী-স্ত্রীতে ঘর বেঁধে আছে। নিজের কয়েক বিঘা পৈতৃক খামার জমি আছে যার কৃপায় দুজনের বেশ ভাল ভাবেই দিন চলে যায়। তাই দিনের অধিকাংশ সময় গ্রামের চিরাচরিত প্রথায় পরচর্চ্চা করে সময় কেটে যায়। রোগা, নিরস চেহারা, সাপের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, হাসেন কম, প্রয়োজন হলে তবে কথা বলেন এবং যখন বলেন তখন চাপা গলায় অগ্ন্যুৎপাত করেন আকৈশোর নিজের খুড়তুত ভাই নিশাপতির সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতা করে চলেন, সুযোগ পেলেই তাকে ছোবল মারেন। নিশাপতির অবস্থা অনেক ভাল। মাঠে ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু, গোলায় গোলায় ফসল তার লক্ষ্মীশ্রীর কথা ঘোষণা করছে। নিশাপতির অবস্থার জন্য নয়—তার ব্যবহার ও পরোপকারিতার জন্য দু-চারখানা গ্রামের লোক তাকে ভাল-বাসে। নিশাপতির বয়স হচ্ছে শশাঙ্কের চেয়ে অনেক ছোট। দুজনের মধ্যে ধূমায়িত অগ্নির কারণ শুধু গ্রামের আবহাওয়া নয়। প্রধান কারণ শশাঙ্কের নিজের ভাই চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহন

শশাঙ্কের চেয়ে অনেক ছোট এবং অনেক গরীব। পিতার মৃত্যুর পর শশাঙ্ক নাবালক ভাইয়ের সমস্ত অংশ গ্রাস করে তাকে যখন নিঃস্ব করে দিল তখন নিশাপতি তাকে আশ্রয় দিল। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণেই সে গ্রামের স্কুল ছেড়ে গ্রামের বুকে একটা ছোট দোকান দিল নিশাপতির সাহায্যে। দোকানের গতির উপর সংসারের গতি নির্ভর করলে চলে না। তার গতি চলে শুধু নিশাপতির মতির উপর। যৌবনে পদার্পণ করলেই চন্দ্রমোহনের বিয়ে দেয় নিশাপতির স্ত্রী তার কোন দূর সম্পর্কের এক নিঃস্ব গরীব আত্মীয়ার কন্যার সঙ্গে। বৌ যখন ঘরে এলো, তখন সারা গ্রাম তার রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন রূপ, এমন সুশ্রী মুখশ্রী, এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল দেহ-ভঙ্গিমা কী করে যে গ্রামের গরীবের ঘরে প্রতিপালিত হল সেটাই আশ্চর্য্য। বিদ্যুৎলতা সত্যিই যেন বিদ্যুতের লতা। তার প্রতি পদক্ষেপে যেন রূপের ঐশ্বর্য্য বিচ্ছুরিত হতে থাকে। বিবাহের পর তার রূপ নিয়ে আলোচনার আগুন বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রামকে তপ্ত রাখল। লতার রূপ তার মায়ের স্থিতিকে পর্য্যন্ত টলিয়ে দিল। বাংলার গ্রাম সহজে কাউকে রেহাই দিতে চায় না। মায়ের যখন অমন রূপ নয়, তখন মেয়ে এ রূপ পেলে কোথায়? সুতরাং মায়ের আসনও টলে উঠল। চন্দ্রমোহনের কুটির গ্রামের এক কোণে বলে, নিশাপতির স্ত্রী তার স্ত্রীকে কয়েকমাস নিজের কাছেই রাখলেন—যতদিন না তার রূপচর্চ্চা কিছু প্রশমিত হয়। গ্রামে কিছু জ্বলতেও দেরী হয় না, আবার কিছু নিভতেও দেরী হয় না। আগুণ নিভে যাবার পর যাদব চক্রবর্ত্তী সেদিকে জাল ফেলবার চেষ্টা করেন অতি সন্তর্পণে, অতি নিপুণতার সঙ্গে—অতি ধীরে ধীরে। সে জাল যেখানে যেখানে ছিঁড়েছে শশাঙ্ক রিপু করে দিয়েছে। সেটাকে ছাড়াবার সময় শশাঙ্ক সাহায্যও করেছে। বুদ্ধি, প্রলোভন, অর্থ, জমি দান

কিছুই যাদব চক্রবর্ত্তীকে সাহায্য করল না। অবশেষে চতুর যাদব চক্রবর্ত্তী জাল গুটিয়ে নিলেন।

"আপনি এতেই হাল ছেড়ে দিলেন—?" শশাঙ্ক তার চকচকে চোখ দিয়ে একদিন প্রশ্ন করল।

"উপায় নেই শশাঙ্ক। বড় লোক-জানাজানি হয়ে গেছে। মরণ ভাল কিন্তু সরম ভাল নয়।"

"তাহলে ত নিশেটা একেবারে গাছে চড়ে যাবে। এবার আমার পরাণটা গেল—।"

"যাবে না—আমি আছি ত। নিশের জোরে চন্দর যে দেওয়ানীটা করেছে, সেটা আমিই লড়ব তোমার হয়ে। টাকা আমার, তদ্বির তোমার।" জমিদারের কথা শুনে শশাঙ্ক যাদব চক্রবর্ত্তীকে আভূমি প্রণাম করল। শশাঙ্কর জমির অর্দ্ধেক পাবার জন্য চন্দ্রমোহন নিশাপতির সাহায্যে দেওয়ানীর শরণাপন্ন হয়েছে। দেওয়ানী মামলা রাবণের চিতাকে ধিকি ধিকি জ্বালিয়ে রাখে, যে হারে সে ত যায়ই, যে জেতে সেও নিঃস্ব হয়, পরিবর্ত্তে পায় শুধু আদালতের চক্রাকার শিলমোহর-যুক্ত একখানা ডিগ্রি।

মথুর শশাঙ্ককে খবর দিয়ে ফিরে এল। খাসকামরায় বিছিয়ে দিল গালিচা, বন্ধ করে দিল চতুর্দ্দিকের জানালা দরজা, আলমারী খুলে বের করে দিল মদের বোতল, গ্লাস ও সোডা। সম্মুখের দরজায় নিজে বসে গেল পাহারায়। এ দৃশ্য জমিদার বাড়ীতে নতুন নয়। মাসে দুমাসে প্রায়ই এ দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যাদব চক্রবর্ত্তী রোজ মদ খান না এবং মাতালও হন না। মাসে একবার বা দু'মাসে একবার এমনি আসর বসে এবং যখন বসে তখন সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দু-দিন চলে। রাত্রে মথুর দরজায় পাহারা থাকে, পেট-কাটা কুঠুরিতে রামসিং থাকে ত্রস্ত এবং জাগিয়ে রাখে আরও পাঁচ ছয় জন সিপাহীকে। সেদিনও

মথুর রামসিংকে খবর দিয়ে দিল। রামসিং নিজের বাছা কয়েক-জন সিপাহীকে হুকুম দিয়ে রাখল। সকলে তাড়াতাড়ি ডাল-রুটি শেষ করে পেট-কাটা কুঠুরিতে চলে এল। তুলশীদাসের রামায়ণ সেদিন থাকল স্থগিত।

শশাঙ্ক যখন চোরের মত জমিদারের খাস কামরায় এলেন তখন যাদব চক্রবর্ত্তীর রক্ত সতেজ হতে আরম্ভ করেছে। শশাঙ্ক এসে জমিদারকে আভূমি প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"এই যে শশাঙ্ক! তোমার ভক্তিকে মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে। বস আমার কাছে। দেওয়ানীর কথা ভুলে মাঝে মাঝে এই পার্থিব জীবনের কথা ভাব।" এই নাও—জমিদার পূর্ণ গ্লাস তার কাছে এগিয়ে দেন। স্রোত কিছুক্ষণ বয়ে যায়। "তোমার দেওয়ানীর শ্রাদ্ধ কেমন গড়াচ্ছে বল। খুলতে কত দেরী? সময় মত আমাকে খবর দিও—আমার উকিলকে লিখে দিয়েছি, সে তোমার মামলা চালাবে। ভয় নেই শশাঙ্ক, খরচ আমিই দেব, যাদব চক্রবর্ত্তী মিথ্যে কথা বলে না।" বেশী কথা বলার অভ্যাস তাঁর নাই, তাই গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলেন। মুখটা একটু বিকৃত করে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। "ব্যাটা মথুর বড় কড়া করে দিয়েছে," শোডা তিনি নিজেই মিশিয়েছেন কিন্তু ত্রুটি মথুরের নামে বলা তাঁর মুদ্রাদোষ। মথুর সেগুলো মাথা পেতে নেয়। এবার বল শশাঙ্ক, তোমার স্নেহের ভ্রাতৃযুগলের কথা বল। এমন সময়ে যাদব চক্রবর্ত্তী শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করেন। ততক্ষণে শশাঙ্কের অঙ্ক ভিতরে যোগবিয়োগ হতে আরম্ভ করেছে। মদ খেলে শশাঙ্কের অঙ্ক খোলে ভাল, মাথাটা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়, ঝোপ বুঝে তিনি কোপ দিতে পারেন।

"আপনার সঙ্গে ইমতুর কিছু হয়েছে?—বাজার বড় গরম

দেখলাম।" শশাঙ্কের কথা শুনে যাদব চক্রবর্ত্তীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেল।

"ইমদুর সঙ্গে আমার! শশাঙ্ক, আমার সঙ্গে কিছু হবার উপযুক্ত লোক ইমদু কবে হল? যাদব চক্রবর্ত্তী মশা মেরে হাত কালো করে না—"

আমিও ত তাই বলি। তাকে নাকি আপনি বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন—আমি ত বললাম এ অসম্ভব। জমিদার আমাদের দয়ার অবতার—এ কাজ তিনি করতেই পারেন না।"

"তুমি ভুল বলেছ শশাঙ্ক। তাকে সত্যিই বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম—ভুল হয়েছে চাবুক মারা হয় নি। যাদব চক্রবর্ত্তী মিথ্যে কথা বলেনা।" শশাঙ্ক নিজের চালের ভুলটুকু বুঝতে পারল।

"এতেই তার এত? তিলকে তাল করেছে!"

"কী করেছে বলই না! এই তোমার দোষ শশাঙ্ক। বড় কুঁথে কুঁথে কথা বল।"

"শুনলাম, সে নিশের সঙ্গে সদরে গেছে ফৌজদারী করতে—এটা নাকি এ যুগে আর চলবে না। থানার দারোগা তার ডায়রী নেয় নি, তাই নিশে তাকে মামলার পরামর্শ দিয়েছে। মস্ত ব্যারিস্টার!—" আরে বাবু জমিদারের নামে কি মামলা হয়! রাজার কি কোন দোষ আছে! শশাঙ্কের শেষের কথাগুলো জমিদার ভালভাবে শুনলেন না, সেগুলোকে তিনি তলিয়ে দিলেন ঘন ঘন তরল অগ্নিপানে। যাদব চক্রবর্ত্তীর যৌবনের রক্ত ফিরিয়ে আনবার জন্যই আজ এই আয়োজন। বড়রাণীর কথার পর থেকেই তাঁর বিদ্রোহী অন্তর যৌবনের লুপ্তপ্রায় মত্ততা ধমনীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সুরা যেটুকু করতে পারে নি, শশাঙ্কের অঙ্কপাত সেটুকু করল। ঘন ঘন কয়েকবার পান করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—দর্পণের সম্মুখে গিয়ে নিজের চেহারাটা

দেখলেন। প্রতিচ্ছবিতে দেখলে সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনকে যেন। দেখলেন সমস্ত পৃথিবীকে সুষমামণ্ডিত, দেখলেন নিজের চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি, দেখলেন তিনি নিজের অন্তরে স্তিমিত ক্ষুধার জাগৃতি।

"আমার নামে ফৌজদারী! শশাঙ্ক, তুমি ঠিক জান! ইমতুর এত সাহস?"

"আজ্ঞে, ইমতুর সাহস ছিল না, তার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। জানতে পারলাম, নিশেই তাকে বিষিয়ে দিয়েছে।"

"শশাঙ্ক, তুমি জ্ঞাতি-শত্রুতা করছ না ত?"

"আজ্ঞে, আমি ত এখানেই আছি। আপনি খবর নিন না।"

"মথুর!"—জমিদার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। "মথুর, খবর নে ত নিশে গ্রামে আছে কিনা—না থাকে, কোথায় গেছে—শুধু এইটুকু। একটু গোপনে খবর নিস।" কিছুক্ষণ পরে মথুর এসে শশাঙ্কর কথাটার সত্যতা প্রকাশ করলো। সে খবর জানাল যে, "নিশাপতি ও ইমতু দু'জনে সদরে গেছে—তবে কেন গেছে জানা গেল না।"

"মথুর—"

"এজ্ঞে—"

"দু গ্লাশ ঢাল দেখি—তুই ব্যাটা বড়ই পাতশে করে দিস, এই তোর মহৎ দোষ। এবার যদি ফিকে হয়েছে, তবে দেখেছ ঐ বন্দুক!" মথুর বন্দুকের দিকে তাকাল না, এমন কথা সে অনেকবার শুনেচে। তাকাল শশাঙ্ক, তাকিয়ে তার অঙ্ক যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। "মথুর, রামসিংকে খবর দে।" কিছুক্ষণ পর রামসিং এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। "রামসিং! তোমার মালিক বেইজ্জৎ হুয়া রামসিং"—শশাঙ্ক বললে।

"কৌন শা—" রামসিং ব্যাঘ্রের মত শশাঙ্কের দিকে তাকালো। শশাঙ্কের অঙ্ক সে দৃষ্টি দেখে একেবারে মুছে গেছে।

"তোমার কাছে কয়জন শেখজি আছে রামসিং?"

"বিশজন আছে হুজুর—হুকুম হো, উসিকো কাম চলে যাবে!"

মথুর প্রভুর আদেশে দরজা বন্ধ করে দিল। রুদ্ধ-দ্বার-কক্ষে কিছুক্ষণ পরামর্শ চলল। সে পরামর্শ সেই চার জন আর সেই চারজনের ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের উত্তর দিকে একটা গগনভেদী চীৎকার আকাশকে স্পর্শ করল। সকলের সমবেত চীৎকার। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত আর্ত্তনাদ ও বাঁশ ফাটার একটা বিশ্রী শব্দ সমস্ত গ্রামটাকে সচকিত করে তুলল। সুষুপ্ত গ্রামের নিদ্রা গেল ভেঙ্গে। সকলে বাইরে এসে দেখল যে, গ্রামের উত্তর দিকে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা রাত্রির অন্ধকারের বুকে আকাশের দিকে ক্ষুধার্ত্তের স্পর্শ জাগিয়ে দিয়েছে। উত্তর দিগন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণবর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। তার বুকে যেন করাল কালীর ক্ষুধিত জিহ্বা। তপ্ত হাওয়া সকল দিকের হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অন্যদিকের শীতল হাওয়া তাকে তৃপ্ত ও শান্ত করবার চেষ্টায় অগ্নিকে যেন স্বাহা আহুতি দিচ্ছে। আগুনের তাণ্ডব লীলা সুপ্ত গ্রামকে স্বপ্নোত্থিত করে তুলল। সকলে ব্যস্ত নিজের ঘর বাঁচাতে। কিছু লোক ছুটল ইমতুর ঘর বাঁচাতে।

গ্রাম যখন ইমতুর অনুপস্থিতিতে তার আশ্রয় বাঁচাতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে চোরের মত কয়েক জন সিপাহী একটি নারীকে অজ্ঞান অবস্থায় যাদব চক্রবর্ত্তীর বদ্ধ ঘরে এনে রাখল। গ্রাম জানতে পারল না—এমন কি উত্তরের অগ্নিদেবতাও দক্ষিণের এই গুপ্ত কাহিনী জানতে পারল না। জানতে পারল বিদ্যুৎলতা, আর জানতে পারল সপারিষদ যাদব চক্রবর্ত্তী। লতার দেহ যখন জমিদারের কক্ষে এসে পৌঁছল, তখন জমিদার সপ্তম বর্গে চড়ে আছে—শশাঙ্ক শশকের স্বপ্ন দেখছেন। লতার আগমনে জমিদার উদার হয়ে উঠলেন, শশাঙ্ক শশকের মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

"তোরা যা। কাল তোরা সকালে—প্রত্যেকে একশো টাকা করে বকশিস পাবি। রামসিং, তুমি পাবে একশ টাকা। মথুর, তুই কিছু পাবি নে। একটু কড়া করে ঢাল দেখি—বেশ রঙ্গীন করবি ব্যাটা। রামসিং, আজ সমস্ত রাত আমার ঘরের সামনে তুমি এবং চার পাঁচ জন সেপাই পাহারা দেবে, যাও। "মথুর!—"

সকলে চলে যাবার পর মথুর দু'পাত্র ঢেলে দিয়ে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে অন্দরের দিকে বারান্দায় বসে গেল। বহির্জগতে অগ্নিদেবতার ক্ষুধা শান্ত হয়েছে ততক্ষণে। অন্তর্জগতে জমিদারের তৃষ্ণা বেড়ে চলেছে লতার যৌবনদীপ্ত অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে। ঘরে একটা চাপা স্তব্ধতা। আবহাওয়া যেন মুক্তির জন্য আর্ত্তনাদ করছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। বাতাস যেন দ্বারে দ্বারে, গবাক্ষে গবাক্ষে মাথা খুঁড়ছে মুক্তির জন্য। তিক্ত মিষ্ট একটা গন্ধ রুদ্ধ কক্ষকে আমোদিত করে রেখেছে।

"শশাঙ্ক!" যাদব চক্রবর্ত্তী একটা গ্লাস তার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করলেন। এই প্রথম তিনি শশাঙ্কের হাতে মদের গ্লাস তুলে দেবার চেষ্টা করলেন। মাতাল হয়েও তিনি সে আভিজাত্য-টুকু রাখতে পারতেন কিন্তু এবার সেটা প্রথম ভাঙ্গলেন। শশাঙ্ক সেটা ভয়ে ভয়ে হাতে নিয়ে মাটিতে রেখে দিল।

"হুজুর—" শশাঙ্কর আর্ত্তস্বর।

"কী শশাঙ্ক, ভয় পেলে? ভয় নেই—তদ্বির তোমার, টাকা আমার। শশাঙ্ক, এজগতে টাকা দিয়ে বাঘের দুধ পাওয়া যায়।"

"হুজুর—এবার আমাকে ছুটি দিন। হাজার হোক আমি ভাসুর ত, ভাদ্র-বৌএর ছায়া ছুঁলে স্নান করতে হয়।"

শশাঙ্কের কথা শুনে জমিদার অট্টহাস্য করে উঠলেন। সে হাসি শুনে শশাঙ্ক যেন বিভীষিকা দেখল, তার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, সমস্ত ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। জমিদারের হাসি

থামার পর যেন শশাঙ্কের হৃদপিণ্ড আবার চলতে আরম্ভ করল।

"শশাঙ্ক, এবার তুমি হাসালে। ভাসুর! ভাসুর যখন তার ভাদ্রবৌকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার বুদ্ধি দেয়, তখন বুঝি স্নান করতে হয় না? পশু কোথাকার! আজ তোমাকে দিয়েই আমি ব্রত উদ্‌যাপন করব শশাঙ্ক। কাজে নেমে পিছিয়েছ কী—দেখছ বন্দুক!"

শশাঙ্ক তখন শূন্যাঙ্ক হয়ে গিয়েছে। জমিদার শশাঙ্কের কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন দর্পণের দিকে। পুরাতন অভ্যাসে গোঁফের শূন্য স্থানটিতে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। দেরাজ থেকে আতর নিয়ে ঢেলে দিলেন নিজের ও শশাঙ্কের জামায়। ঘরে আর একটি গন্ধ হাওয়ায় মিশ্রিত হয়ে তাকে বহুগন্ধ করে তুলল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন লতার দিকে—ভদ্রভাবে, ত্রস্ত পদক্ষেপে তার পাশে গিয়ে বসলেন। স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তার অনবগুণ্ঠিত মুখের দিকে—তার স্খলিত-বসন-পরিপূর্ণ দেহের দিকে। মাতাল হলেও যাদব চক্রবর্ত্তী শশাঙ্ক নয়। তিনি সহজে লতার দেহকে স্পর্শ করলেন না। "লতা—লতা"—আঃ—শশাঙ্ক এ যে উত্তর দেয় না। তুমি একবার ডেকে দেখ না! ওঃ, তুমি ত আবার নাম ধরে ডাকবে না। "লতা—বিদ্যুৎলতা"—কোন সাড়া নাই। অসহায় জমিদার তার দেহকে নাড়িয়ে দিলেন, দেহটি অসাড়ভাবে নড়ে উঠল। আবার গড়িয়ে দিলেন অন্য দিকে, অচেতন পদার্থের মত গড়িয়ে গেল যেন। জমিদারের কেমন সন্দেহ হল, তিনি তাড়াতাড়ি তার নাকের নীচে হাত দিলেন—এ কী! পাগলের মত তিনি লতার জামার ভিতর দিয়ে বুকের উপর হাত দিলেন। এ কী! সব মসৃণ—সব তুহিন শীতল। লতার পৃথিবী তখন শান্ত ও

নিদ্রিত। "শশাঙ্ক—মথুর—মথুর—" তিনি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন। মথুর ঘরে ঢুকলে জমিদার তার দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে বললেন—"মথুর, মথুর—দেখ ত এ বেঁচে আছে কি না! মথুর, শিগ্‌গির দেখ।" মথুর লতাকে পরীক্ষা করে দেখে যা মত প্রকাশ করল, তাতে জমিদার সেখানে বসে পড়লেন। শশাঙ্ক সমস্ত পৃথিবীটাকে একটি শূন্যাকার দেখল। মথুর তাড়াতাড়ি রামসিংকে ভিতরে ডেকে কী যেন বলল, রামসিং-এর সিদ্ধির নেশাটুকু মুহূর্ত্তে শূন্য হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি শশাঙ্ককে বলল—"বাবু, আজ ভাগিয়ে।" শশাঙ্ক অর্দ্ধমুক্ত দুয়ার দিয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে প্রস্থান করল। রামসিং দ্বার দিল বন্ধ করে।

"রামসিং! তুমি ওকে ছেড়ে দিলে, ও যদি বাইরে গিয়ে বলে দেয়।"

"হুজুর, বলিয়ে উ শালা যাইবে কুথায়। উহার সামনে কোন ব্যবস্থা করা ঠিক হইত না।" মথুর—তুম বড় মাইকে খবর দাও।

মথুর যখন বড়রাণীকে ডেকে নিয়ে এল ততক্ষণে রামসিং তার মালিককে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়ে দিয়েছে। জমিদার কোন কাজে বিন্দুমাত্র বাধা দিলেন না। বড়রাণীকে দেখে রামসিং আভূমি কুর্নিশ করল পুরাতন অভ্যাসে। বড়রাণী ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালেন তার আবহাওয়া দেখে, মাটিতে লতার দেহ দেখে। স্থির অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীর দিকে।

"এ তুমি কী করলে গো—এমন করে একজন সতী-লক্ষ্মীর সর্বনাশ করলে? এর ফল যে সমস্ত বংশকে বইতে হবে সে হুঁসও কি তোমার ছিল না?" বড়রাণীর হৃদয় উঠল কেঁপে, তাঁর সমস্ত পৃথিবী উঠল কেঁপে, তার অগ্নিময় দৃষ্টি কুয়াসায় যেন ঝাপসা হয়ে উঠল।

"মথুর ! তুমি পুলিসে খবর দাও। এ জিনিস চেপে যাওয়া আরো পাপ।"

"পুলিস—!" মথুর যেন কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, পুলিস—খুনের পাপ কিছু নয় কিন্তু সতীর ধর্ম্মনষ্ট খুনের চেয়ে বড় পাপ। আমি ছেলের মা হয়ে এ হতে দেব না—এতে আমার নিজের অপমান মথুর!" বড়রাণী শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। সামনের দ্বারে কে যেন টোকা দিল, রামসিং মুখ বার করে শুনে আবার দ্বার দিল বন্ধ করে।

"মা-জী—পুলিশ ! আমাদের সমস্ত বাড়ী পুলিশ ঘিরিয়ে লিয়েছে—মা-জী কী হবে ?"

"পুলিশ !" বড়রাণী আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

"আমায় ধরিয়ে দাও বড়বৌ—পুলিশকে আসতে দাও!" জমিদার এতক্ষণে কথা বললেন।

"রামসিং, তুমি ও মথুর লতার লাস নিয়ে আমার পিছনে পিছনে এস। শিগ্‌গির, এক মিনিট দেরী করো না। সম্মুখে বড়-রাণী, পিছনে রামসিং ও মথুর লতার মৃতদেহ নিয়ে অন্দরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন বড়রাণী একা মথুরকে নিয়ে। মথুরকে বললেন—"মথুর, শিগ্‌গির ঐ গেলাসটা দে—শিগ্‌গির—ওটাতে কে খেয়েছে ?"

"বাবু—"

"দে ওটা। শিগ্‌গির।" বড়রাণী সেই গ্লাস থেকে এক মুখ মদ মুখে নিলেন, কয়েকবার কুলকুচি করে ফেলে দিলেন পিক-দানিতে। এবার তুই যা মথুর, আলোটা নিভিয়ে দে।" মথুর আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্দরের দিকে বের হয়ে গেল। বড়রাণী গিয়ে বহুদিন পরে যাদব চক্রবর্ত্তীর শয্যায় শুয়ে পড়লেন।

"বড়বৌ !—"

"চুপ—বড় বৌ নয়, বড়রাণী বল। শোন, তোমাকে শেষ কথা বলে দিই। যদি নীলুর ভবিষ্যৎ বাঁচাতে চাও তবে তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে, পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলব। যদি সাহেব এই ঘরে ঢোকে তবে তুমি অজ্ঞানের মত পড়ে থেক, মাঝে মাঝে দু-একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলো।"

সম্মুখের দ্বারে ততক্ষণে জোরে শব্দ আরম্ভ হয়েছে—"দুয়ার খোল—ডরজা খোল"—ইংরাজের কণ্ঠস্বর।

"মথুর!—"

মথুর এসে ঘরে ঢুকল। "মথুর, আমি বেরিয়ে যাবার পর তুই দরজা খুলে দিস—আর সাহেবকে বলবি যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখ করব।"

যাবার সময় বড়রাণী নিজের গায়ের জামাটি খুলে বিছানার উপর রেখে গেলেন। "এবার আলো জ্বেলে দরজা খুলে দে—"

আলো জ্বলল। মথুর দুয়ার খুলবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সাহেব উদ্যত রিভলবার হস্তে দারোগার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। পিছনে কয়েকজন পুলিস। ঘরে প্রবেশ করেই ইংরেজ সন্তানও আবহাওয়ার গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিলেন। দিলেন না কেবল দারোগা, বোধহয় তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, মনে হয় তিনি এরূপ আবহাওয়ায় অভ্যস্ত। সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে ঘরের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে দেখে নিলেন অনুসন্ধানের সূত্র আবিষ্কারের জন্য। পালঙ্কের উপর জমিদারের কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তখন তার সঙ্গে কোন কথা বলবার চেষ্টা না করে তিনি তাঁর চেহারাটা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন। পুলিসের দৃষ্টিতে, সোৎসাহে তুলে নিলেন শয্যার উপর থেকে নারী-দেহের জামাটি। সাহেবের চোখ দুটি যেন নিজের কৃতিত্বের গর্ব্বে জ্বলে উঠল। তিনি সেটা কয়েকবার পরীক্ষা করে দারোগার হাতে

তুলে দিলেন গর্ব্বের সঙ্গে—"It will give you the clue Sub Inspector—a clean-cut clue! দারোগাও যেন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত সমস্যার সমাধান দেখলেন। সাহেবের বুদ্ধির কাছে নিজের মাথাটা অবনত হয়ে গেল। সাহেব ধীরে ধীরে ঘরের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, দেখতে লাগলেন প্রত্যেকটি জিনিস, সন্ধান করতে লাগলেন অপরাধের ও অপরাধীর মূল সূত্রটুকু। পরিত্যক্ত গেলাস দুটির একটি তুলে নিয়ে তিনি নিজে একবার ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন, তারপর এগিয়ে দিলেন দারোগার হাতে। সাহেব গিয়ে দাঁড়ালেন দেওয়ালে লম্বিত দর্পণটির সম্মুখে। সেটার বুকে কী দেখলেন জানি না, তবে সাহেব যেন সেখানে নিজের চেহারাটা বহু দিন পরে দেখে একটু চমকে উঠলেন—হঠাৎ যেন তাঁর প্রতিচ্ছবির পাশে ফুটে উঠল কতকগুলি স্মৃতির অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনের মৃতপ্রায় ছবিগুলিও যেন আজ আবার স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়। সাহেব তাড়াতাড়ি সরে এলেন তার সম্মুখ থেকে, ভুলতে চাইলেন আবার নিজের অতীতকে, মুছে ফেলতে চাইলেন সেই অস্পষ্ট ছবিগুলোকে।

সাহেব গিয়ে আলমারীর ডালাটি খুলে দেখলেন, তাতে থরে থরে সাজান আছে বিভিন্ন প্রকারের মদ, গ্লাস ও সিগারেটের টিন। জমিদারের সুরুচিকে তিনি মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না।—"Sub-Inspector!"

"Yes, Sir"—দারোগা গিয়ে প্রভুর পাশে দাঁড়ালেন পদযুগল এক করে।

"Your Zaminder seems to be a decent man." সাহেবের এ উক্তি দারোগাকে কেমন যেন নিরুত্তর করে দিল। অভ্যাসের দোষে তিনি উত্তর দিলেন নিরর্থক ভাবে—"Yes, Sir".

ঘরের অনুসন্ধান শেষ করে সাহেব জমিদারের সঙ্গে একবার

কথা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যাদব চক্রবর্ত্তীর কয়েকটা জড়ান ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাকে তিনি বিশেষ উপলব্ধি না করতে পেরে দারোগাকে জানালেন, তিনি সমস্ত বাড়ীটা তল্লাসি করবেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করতে। ভদ্রঘরের ভিতরের আব্রুর মর্য্যাদা সাহেব করতে জানত, কিন্তু সেটাকে নষ্ট করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত দেশী পুলিস। প্রভুর কথায় দারোগা জমিদারের চাকরকে ডেকে অন্দরে খবর দিতে বললেন এবং জানিয়ে দিলেন সব ঘর খুলে দিয়ে মেয়েরা যেন একটি ঘরে চলে যান। মথুর সব ব্যবস্থা করে এসে দারোগাকে খবর দিলেন। সাহেব, দারোগা ও দুজন পুলিস ভিতরে প্রবেশ করল। জমিদারের কাছে থেকে গেল অবশিষ্ট পুলিসরা। অন্দর মহলের প্রত্যেকটি ঘর তল্লাসী হল তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। কিন্তু কোন তল্লাসীই ফলপ্রসূ হল না। তবে প্রতিস্থানেই সাহেব জমিদারের সুরুচির প্রশংসা করলেন। অবশেষে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন ঠাণ্ডা-ঘরের সম্মুখে। ঠাণ্ডা-ঘর অন্দর মহলের কয়েকটি ঘরের মাঝখানে অবস্থিত। সে ঘরে জানালা নাই, আছে মাত্র সম্মুখে একটি লৌহ-ফটক, তাতে সর্ব্বদাই একটি বৃহৎ তালা লাগান থাকে, তার চাবি থাকে বড়রাণীর কাছে। এই ঘরের চাবি তাঁর কাছেই থাকে— যিনি সংসারের কর্ত্রী। এই চাবিই ইঙ্গিত করে সুস্পষ্টভাবে এ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী কে? সে চাবি এখনো বড়রাণীর কাছেই আছে। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণের পর ছোট রাণী যখন অন্দর মহলে প্রবেশ করে আঙ্গিনায় দাঁড়ালেন পাথরের থালার বুকে দুধ ও আলতার উপর, তখনও এ ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। কয়েকদিন পর বড়রণী ঠাণ্ডা-ঘরের চাবি যখন ছোট রাণীর হাতে তুলে দিলেন, তখন ছোটরাণী সেটিকে তার পায়ের উপর রেখে পা দু'খান জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। বললেন,—"দিদি, তুমি আমাকে নাও—আমাকে কিছু দিও না।" বড়রাণী তাকে বুকে

জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করলেন। চাবিটা তারপর থেকে যথারীতি তাঁরই কাছে থেকে গেছে।

সাহেব এসে দাঁড়ালেন ঠাণ্ডা-ঘরের সম্মুখে, তাকালেন একবার দারোগার দিকে, দারোগার দৃষ্টি ঘুরে গেল মথুরের উপর।

"এ ঘরের চাবি ?"

"এজ্ঞে—এটার চাবি বড়মার কাছে থাকে সব সময়। এটা খাজনা-ঘর কিনা। এখানে অন্য কেউ ঢুকতে পারে না।"

"চাবি চেয়ে আন, এটা তল্লাসী করতে হবে।"

মথুর কিছুক্ষণ পর বড়রাণীর সঙ্গেই ফিরে এল। বড়রাণী এসে সাহেবকে নমস্কার করে দাঁড়ালেন, সাহেবও প্রতি-নমস্কার করে তাঁকে যথাসম্ভব সম্মান দেখালেন।

"আপনি বোড়ো রাণী আছেন ? আপনাকে কোষ্টো ডিবার জন্য আমি ভয়ানোক ডুখিত আছি।" ভাঙ্গা ভাষায় সাহেব বড়রাণীকে জানালেন যে, কর্ত্তব্যের খাতিরে তাকে এসব কাজ করতে হচ্ছে, সেজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। বড়রাণী জানালেন যে, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাহেবকে তাঁর কর্ত্তব্য সাধনে সাহায্য করবেন। সাহেব যেখানে বড়রাণীর কথা বুঝতে পারছিলেন না, সেখানে দারোগা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে সাহেবকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। মাঝে মাঝে দারোগা বড়রাণীকেও সাহেবের ইংরাজি-মিশ্রিত বাংলাকে তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

"এটা কী ঘর আছে ?"—সাহেব প্রশ্ন করলেন।

"এটাতে জমিদারের টাকা পয়সা, আমাদের গহনা, পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চিত মণিমুক্তা ইত্যাদি আছে। এবং চাবি আমার কাছে আছে, খুলে দিচ্ছি এক্ষুনি।—কিন্তু একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। জুতো খুলে এ-ঘরে যদি যান, তবে বড় বাধিত হব। কারণ—

"Yes—Yes—সে আমি মানি—যোদি প্রোয়োজন হয়, তোবে আমি জুটা খুলিয়াই যাইব—"

বড়রাণী ঠাণ্ডা-ঘরের লৌহ ফটকের চাবি খুলে দিলেন—মথুর ফটকটিকে টেনে খুলে দিল। লৌহ-কপাটের কর্কশ শব্দ কার যেন একটা আর্ত্তনাদ টেনে বের করল সেই ঘর থেকে। আর্ত্তনাদ রাত্রির অন্ধকারে মিশে গেল সুদূরের স্তব্ধতায়। একটা ভাপসা হাওয়ার ঝলক এসে সকলকে চকিত করে দিল। সাহেব তাঁর টর্চ্চের ভীষণ আলো ফেললেন ঘরের ভিতর। ফটকের ঠিক সামনের বিপরীত দেওয়ালে টাঙ্গান আছে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের একখানা বৃহৎ প্রতিকৃতি। সাহেব তাড়াতাড়ি সামরিক প্রথায় প্রতিকৃতিকে অভিবাদন জানালেন। ব্যাপারটি ঠিক সম্যক বুঝতে না পেরে দারোগা অভ্যাস দোষে সাহেবকেই অভিবাদন জানালেন। টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব দেখলেন, দেওয়ালের সর্ব্বত্র হিন্দুর দেব-দেবীর ছবি। মেঝের মাঝখানে একটি বহুমূল্য বেনারশী শাড়ীর উপর কয়েকটি দেব-দেবীর ছোট ছোট মূর্ত্তি রাখা আছে। রাখা আছে তাদের সম্মুখে কিছু শুষ্ক ও কিছু তাজা ফুল। মধ্যস্থলে গোপালের গলায় একটি ফুলের মালা, সম্মুখে রাখা কয়েক প্রকারের ফল ও মিষ্টির ভোগ, পাশে জ্বলছে একটি বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপ। সমস্ত ঘরখানা যেন ভক্তি ও ভয়, বুদ্ধি ও শুদ্ধির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। সম্মুখের দেওয়ালে প্রোথিত কয়েকটি লৌহের সিন্ধুক—প্রত্যেকটির গায়ে দুটি বৃহৎ তালা—জমিদারের, জমিদারির অর্থ ও অনর্থের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জানাচ্ছে। বড়রাণী সাহেবকে অনুরোধ করলেন ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখবার জন্য। সাহেব কয়েকবার ঘরের অভ্যন্তরটি টর্চ্চের আলোতে দেখে বড়রাণীকে জানালেন যে, ভিতরে যাবার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি ফটক বন্ধ করে দিতে পারেন। কর্কশ শব্দে আবার লৌহ-ফটক যেন একটা আর্ত্তনাদকে

ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিল। পঞ্চম জর্জ ও গোপাল দু'জনেই যেন মৃদু হেসে উঠলেন—কে বাঁচাল, কে জানে!

সাহেব ফিরে এলেন জমিদারের ঘরে। বড়রাণীও তাঁকে অনুসরণ করলেন,—এবার শেষ রক্ষা করতে হবে। ঘরে পৌঁছে সাহেব জমিদারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করে আবার ব্যর্থ হলেন। বড়রাণীকে প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারলেন যে, প্রতি শনিবার ও বৃহস্পতিবার জমিদার এই ঘরে বসে মদ্যপান করেন এবং ততক্ষণ করেন যতক্ষণ না তিনি অচেতন হয়ে যান। অন্যদিন তিনি মদ স্পর্শও করেন না।

"জমিডারের সঙ্গে অন্য বেক্‌টি কে ছিল?"—সাহেবের এ প্রশ্নে বড়রাণী মাথা নীচু করে নম্রকণ্ঠে যা বললেন, তা শুনে শুধু দারোগাই নয়, সাহেবও চমকে উঠলেন।

"আপনি drink করেন?—আপনাদের societyতে"—সাহেব যেন আর ইংরাজি বাংলা কোন ভাষাই খুঁজে পেলেন না। দারোগা সেটা বুঝিয়ে দিলেন বড়রাণীকে।

"হ্যাঁ, হুজুর—এই দু'টো দিন জমিদারের সঙ্গ দেওয়া আমার বহুদিনের অভ্যাস। বিয়ের পর থেকেই এ অভ্যাসটি আমাকে জোর করে করতে হয়েছে। এ বিষ আমি খাই যাতে স্বামী আমার অন্যদিকে মন না দিতে পারে। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য এ জিনিস কেন, বিষও আমি পান করতে পারি।"

সাহেব সবটা এবার সম্যক বুঝতে পারেলন না, তাকালেন দারোগার দিকে। দারোগা তখন কাটা কাটা ইংরাজিতে সেটা সাহেবকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। সাহেব বলে উঠলেন—

"That's good—good like a good wife"। এখন সাহেব বুঝতে পারলেন,—কেন তিনি বড়রাণীর কথাবার্তায় মদের গন্ধ পাচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি ব্যাপারটিকে বিশেষ অনুসন্ধান করেন

নাই। ভাবলেন—হয়ত বা ঘরের আবহাওয়ার গন্ধ এখনো তাঁর নাকে বা মস্তিষ্কে আঘাত করছে। সাহেবের কথায় দারোগা হাতের জামাটি বড়রাণীকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—

"দেখুন ত, এ জামাটি কার ?"

"ওটা আমারই জামা। দরজায় আপনারা যখন ধাক্কা দিচ্ছিলেন, তখন তাড়াতাড়িতে ওটা আমি বিছানার ওপর ফেলে গিয়েছিলাম। প্রমাণের জন্য আমি আমার গায়ের জামাটাও খুলে দিতে রাজি আছি।" বড়রাণীর কথাগুলো দারোগা সাহেবকে বুঝিয়ে দিলে তিনি রাণীর সততার প্রশংসা করলেন। বড়রাণী ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিজের গায়ের জামাটি খুলে এনে দারোগার হাতে দিলেন।

সাহেব তাঁর দল নিয়ে ছেড়ে গেলেন জমিদার বাড়ী। যাবার সময় বড়রাণীর কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে গেলেন সেই রাত্রে সকলকে কষ্ট দেবার জন্য—তার অন্দরের আব্রুকে আঘাত করার জন্য।

পুলিসের দল চলে যাবার পর বড়রাণী পাগলের মত দৌড়ে গেলেন ঠাণ্ডা-ঘরের সম্মুখে। ক্ষিপ্রহস্তে খুলে দিলেন তার লৌহ-ফটক। আবার আর্ত্তনাদ করে উঠল যেন ঘরের আবহাওয়া। বড়রাণী লুটিয়ে পড়লেন গোপালের সম্মুখে, আর্ত্তনাদ করে বললেন—"গোপাল! আমার ঘর রক্ষা করো—তাঁর অচেতন দেহটি লুটিয়ে পড়ল গোপালের পদতলে। পাথরের গোপালের দৃষ্টিতে তখন অর্থময়, ক্ষমাময় হাসি!

যাবার সময় পুলিস সাহেব সঙ্গে মথুরকে নিয়ে গেলেন শশাঙ্কের বাড়ী। নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল জানি না। তবে প্রকাশ করলেন যে, মথুরের সাহায্য সেখানে প্রয়োজন হবে। পুলিস সাহেব কিছু পূর্ব্বেই একদল সিপাহী পাঠিয়ে শশাঙ্কের বাড়ী ঘিরিয়ে

ফেলেছিলেন। জমিদার বাড়ী থেকে ফিরে গিয়ে শশাঙ্ক নিজের ঘরে বসে শশকের মতই মাথাটি লুকিয়ে দিয়ে মনে করছিল যে, তার অস্তিত্ব সকলের অগোচরে চলে গিয়েছে। অন্ধকার ঘরে বসে শশাঙ্ক নিজের ভূত ভবিষ্যতের অঙ্ক কষে উঠতে পারছিলেন না, পারছিলেন না নিজের সম্মুখের পথ দেখতে। ক্রমে ক্রমে যেন সে ঊর্ণনাভের চক্রাকার সূক্ষ্মজালে জড়িয়ে পড়ছিল। এমন সময় সে জানতে পারলো যে, পুলিস তার বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর মত সম্মুখে দেখল সাহেবকে, দেখল তার পাশে দারোগাকে, দেখল তার পেছনে মথুরকে। সে দৃশ্য দেখে শশাঙ্কের সমস্ত অঙ্কই যেন ভুল হয়ে গেল। যোগে আর বিয়োগে যেন একত্রিত হয়ে সবই ভগ্নাংশ হয়ে গেল।

পুলিস সাহেবের সমস্ত প্রশ্নই তার কাছে এক মনে হল। তাই প্রত্যেকটির উত্তরে সে শুধু বলতে লাগল—"হুজুর, আমি কিছু জানি না, সব জানে জমিদার। সব জানে যাদব চক্রবর্ত্তী—সব জানে—"

"Shut up you dog—" সাহেবের হুঙ্কারে শশাঙ্কের একমাত্র ভাবনাও যেন বন্ধ হয়ে গেল। সে শুধু পাগলের মত সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ গিয়ে জড়িয়ে ধরল দারোগার পা—উত্তরে দারোগা পা ঝাড়লে সে গিয়ে ছিটকে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে। এ যেন পদোন্নতি! শশাঙ্কের বাড়ী তল্লাসী করে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়াতে পুলিস শুধু শশাঙ্ককেই গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে গেল। পুলিসের কার্য্য-পদ্ধতির সেটা একটা বিশেষ অঙ্গ!

পুলিসের দল স-শশাঙ্ক চন্দ্রমোহনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে শূন্য বাড়ীতে চলল তল্লাসী, অন্বেষণ চলল লতার অস্তিত্বের। অনুসন্ধানের পদে পদে ব্যাপারটি যেন কেমন ঘনীভূত

হয়ে উঠল। চন্দ্রমোহনের শূন্য বাড়ী যেন থেকে থেকে আর্ত্তনাদ করবার চেষ্টা করল। তার প্রতিটি রন্ধ্র যেন উত্তর দিতে চাইল লতার অস্তিত্বের বিষয়ে। বিক্ষিপ্ত তৈজশপত্র, দরিদ্র আসবাব যেন পুলিস সাহেবকে বলতে চাইল লতার অস্তিত্বের বিষয়ে। কিন্তু সম্মুখে মথুরকে দেখে জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তীর ভয়ে তারা নির্ব্বাক হয়ে গেল। তাদের ভাষা যেন রুদ্ধ হয়ে কণ্ঠেই লীন হয়ে গেল।

পুলিস সাহেব লতার শোবার ঘর তল্লাসী করবার সময় দেখলে, সেখানে একটি সামান্য শয্যা বিধ্বস্ত হয়ে আছে। দেওয়ালে টাঙ্গান দর্পণের কাছে পড়ে আছে খানিকটা সিঁদুর ও পড়ে আছে কতকটা সস্তা দরের পাউডার। অনতিদূরে একটা রং-চটা টিনের বাক্সের ভিতর থেকে একটা শাড়ীর খানিকটা অংশ বের হয়ে আছে। বাক্সের অন্তরটি তখনও যেন বিধ্বস্ত। পুলিস সাহেবের চোখে যেন সমস্ত বিষয়টি কেমন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল। প্রথম থেকে আবার যেন তিনি তাঁর চিন্তাধারার স্রোতটি বদলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এতক্ষণ তিনি যা ভেবে আসছিলেন, তার সবটুকুই যেন মুছে গেল লতার ঘরের সাজশয্যার স্পষ্ট নিদর্শন দেখে। অনুসন্ধিৎসু মন তাঁর আরও চঞ্চল হয়ে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করতে লাগল নতুন সূত্রধারার জন্য। ঘরের এক কোণ থেকে অকস্মাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন একটি ক্ষুদ্র শিশি। ক্ষিপ্রগতিতে তুলে নিয়ে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে চীৎকার করে উঠলেন—

"Sub-Inspector !"

"Yes, sir—" দারোগার মুদ্রা দোষোক্তি !

"Poison—জহর হ্যায় !" পুলিস সাহেবের চিন্তাধারার গতি আবার পিছিয়ে গিয়ে নতুন ধারা নেবার চেষ্টা করল। "Strange —a mystery !!" কোন বিষয়ের অন্বেষণে বুদ্ধির ঝলক যখন জট পাকিয়ে যায়, তখন তাকে বেশী অনুসরণ করলে জটগুলি

আরো জটিল হয়ে ওঠে। তখন তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সে বিষয়টি সেখানে, সেই অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা। পুলিস সাহেব শিশি, শশাঙ্ক ও সামান্য কয়েকটা নমুনা নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করলেন।

কয়েকদিন পর শশাঙ্ক মুক্তি পেল—ফিরে এলো গ্রামে। রুদ্ধশ্বাস হতবাক শশাঙ্ক নিজেকে নিজের বাড়ীতে আবার কয়েদ করে ফেলল। তারও কিছুদিন পরে পুলিস গোঁজামিল দিয়ে ব্যাপারটিকে "খতম" অর্থাৎ Final report দিয়ে দিল। মিলের জন্য পুলিস নয়—গোঁজার জন্য পুলিস, গোঁজামিলের জন্য পুলিস! সরকারের ঘরে লতার কেস শান্ত হ'ল। তার মৃত্যুর নথি লাল ফিতায় বন্ধ হয়ে চলে গেল ধূলি-ধূসরিত নথিখানায়। শান্ত হল পুলিস, অক্ষমের শান্তি পেলেন পুলিস সাহেব। এই কেসের সার্থক তদন্তের জন্য হল তার পদোন্নতি।

কিন্তু লতার আত্মা সমস্ত গ্রামটির চতুর্দ্দিকে আকাশে, বাতাসে, যাদব চক্রবর্ত্তীর শিরায় শিরায় আর্ত্তনাদ করে বেঁড়াতে লাগল। শান্ত হল তার স্বামী চন্দ্রমোহন, শান্ত হ'ল নিশাপতি, শান্ত হ'ল শশাঙ্ক। সমস্ত গ্রামটি ধীরে ধীরে শান্ত হ'ল। শান্ত হ'ল না শুধু তিন জন—যাদব চক্রবর্ত্তী, বড়রাণী আর লতার বুভুক্ষু অতৃপ্ত আত্মা।

সেদিন কী একটা অছিলা করে জমিদার তাঁর বাড়ীতে পুরুষ মহলে একটা ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন অবস্থা তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই হ'ত। যাদব চক্রবর্ত্তী লোককে খাওয়াতে ভালবাসতেন, পরিতৃপ্ত করে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন, অছিলার অভাব হ'ত না। এমনি একটা অছিলা সেদিনও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। মহকুমা থেকে ঠাকুর ও চাকর এসেছে রাঁধবার জন্য, মিষ্টি করবার জন্য এসেছে ময়রা। পেট-কাটা কুঠুরীর কাছে ভিয়েন বসিয়ে মিষ্টি তৈরী হল, তার পাশে সাময়িক চালা তুলে রাঁধবার ব্যবস্থা

হল। জমিদার বাড়ীর বহিরংশ মৌমাছির চাকের মত কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে ভরে উঠল। এমন অছিলার ভোজ-ভাতে তিনি শুধু নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনই নিমন্ত্রণ করতেন না—নিজের গ্রামের সব প্রজাকেও নিমন্ত্রণ করতেন। পৃথক পৃথক পাতার ব্যবস্থা হলেও পরিতৃপ্তির কোন পার্থক্য থাকত না। সকাল থেকে রন্ধন কার্য্য আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব শেষ হল। সন্ধ্যার পর থেকে সারি সারি পাতা পড়তে থাকল। পাত্র-পংক্তির মর্য্যাদা অনুসারে পংক্তির পার্থক্য রক্ষা করা তখন ছিল কৌলীন্য। সে পার্থক্য তখনকার সমাজের ভিত্তি ছিল, তাতে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি তখন, কারণ তার বহিরাবরণেই ছিল শুধু পার্থক্য, অন্তরটি ছিল এক সূত্রে গাঁথা। ভোজের হু'দিন আগে থেকে মহকুমা হাকিম গ্রামে তাঁবু ফেলেছিলেন। যাদব চক্রবর্ত্তী এই আয়োজন করেন তাঁরই সম্মানে, এসব বিষয়ে কোন ত্রুটি হত না, হলে তখন জমিদারী চলত না। চতুর্দ্দিকে আলো-ঝলমল চাঞ্চল্যময় ব্যবস্থা—তার পাদপ্রদীপে শ্রেণীবদ্ধ পংক্তি-ভোজন। জমিদারের সুদৃশ্য অতিথি ভবনের একটি অতি বৃহৎ ঘরে মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষ্কার মেঝেতে দশটি আসন পড়েছে—কেন্দ্রে হাকিম, তাঁর পাশে যাদব চক্রবর্ত্তী। শেষের দিকে থানার দারোগা। ঘর এক হ'লেও পংক্তি পৃথক। তখন দারোগা আর হাকিম একই পংক্তিতে বসতে পারত না। সে যুগের সেই পার্থক্য শাসনকে সংযুক্ত রেখেছিল। সে দশটি আসনে রূপার পাত্রে খাবার দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাঁচের কদর তখনও আসেনি, তাই সোনা রূপার ব্যবস্থাও ছিল, অস্তিত্বও ছিল। যাদব চক্রবর্ত্তী একশ' লোককে রূপার পাত্রে ভোজন করিয়ে দিতে পারতেন।

রাত্রি প্রায় দশটা। সে ঘরের পরিবেশন সবে আরম্ভ হয়েছে। এমন সময় একজন লোক এসে দারোগার হাতে কী একটা কাগজ

দিল। দারোগা সেটা ঝাড়-বাতির আলোতে পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল। সম্মুখের পাত্র থেকে হাত গেল উঠে—থেমে গেল মাঝপথে। যাদব চক্রবর্ত্তী আড়চোখে একবার তাকালেন—তাকালেন একবার স্তম্ভিত দারোগার দিকে, তাকালেন আর একবার নিবিষ্ট মনে আহার-রত হাকিমের দিকে।

"কী হল দারোগা বাবু? ওরে, তোরা দেখ, দারোগা বাবুর কী চাই—পাত থেকে হাত উঠে যায়, তোরা কেমন পরিবেশন করিস। জানেন হুজুর, আমার বাবা বলতেন যে, খেতে খেতে লোক যদি হাতই তুলবার সময় পেল, তবে আর কী খাওয়ালি?"

"ঠিকই বলতেন তিনি চক্রবর্ত্তী মশায়। আমি হাত তুলবার এখনো ফুরসতই পাই নি।" হাকিম কী যেন একটা চিবুতে চিবুতে সংস্কৃত উচ্চারণের মত মুখের জিনিসটিও ভাঙলেন, বাংলা কথা-গুলোকেও ভাঙলেন।

"না হুজুর—সে রামও নেই—" তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দারোগা হাকিমকে কি যেন একটা বলতে চান।

"হুজুর, হুকুম হয় ত আমি উঠি—" দারোগার প্রশ্নে সকলেই তার দিকে তাকাল। হাকিমও একবার বাঁকা দৃষ্টি ফেলে মুখ থেকে কী যেন একটা টেনে বের করলেন।

"কেন, কী হল?"

"হুজুর, এক্ষুনি খবর এল, যেন কারা এসে থানায় খবর দিয়েছে যে, ময়নামতীর চরে শশাঙ্ক রায়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। রাত হয়েছে—এক্ষুণি না গেলে হয়ত শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।" সংবাদটা যেন ঝাড় লণ্ঠনের দোদুল্যমান রং-বেরং-এর ঝাড়ে লেগে ঝন ঝন করে উঠল। প্রতিটি ঝাড়ের রং-এর সঙ্গে সে সংবাদের রংও যেন এক একজনের মনে এক এক ভাবে প্রতিফলিত হ'ল। জমিদার নিঃশব্দে সে সংবাদ শুনলেন। হাকিম নির্লিপ্তভাবে শুধু

একবার শুনে পাতের উপর একটা বড় মাছের মুড়ো ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে থাকলেন। অন্য সকলের হাত স্তব্ধ হয়ে গেল। বিদ্যুৎ-চকিতে একবার জমিদারের দিকে তাকিয়ে নিলেন তারা, যাদব চক্রবর্ত্তী সেটুকু লক্ষ্য করতে ভুল করেন নি।

"খেয়ে নিন, তার পরে যাবেন। কয়েকটা চৌকিদার ও কয়েকটা কনেষ্টবল সেখানে মোতায়েন করতে বলুন। এমন খাওয়া ছেড়ে—" লোকটা আর মরবার সময় পেল না। হাকিমের হুকুমে আবার সকলের হাত পাত্রস্থ হল।

শশাঙ্ক রায় সত্যই আর মরবার সময় পায় নি। ঠিক সেই সময়ে না মরলে সে হয়ত আরো কাউকে মেরে মরত। সে মরবে বলেই আজ এই ভোজের ব্যবস্থা। আজ এই পংক্তি ভোজের ব্যবস্থা তারই মুক্তির জন্য। যাদব চক্রবর্ত্তীর বহিরাঙ্গণে যখন ভোগের চরম চাঞ্চল্য, লোকের কোলহল, পরিবেশনকারীদের দৌড়াদৌড়ি, পংক্তিতে ভোগের চরম ব্যবস্থা, ঠিক সেই সময় গ্রামের অদূরবর্ত্তী ময়নামতীর চরে নির্মমভাবে হত শশাঙ্ক রায়ের মৃতদেহ বালুর উপর শুয়ে তাকিয়ে আছে স্থির ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে নক্ষত্রখচিত অর্থহীন, ইঙ্গিতহীন আকাশের দিকে। শশাঙ্ক রায়ের সমস্ত অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ইহজগতে। শান্তি এসেছে তার অন্তরে, তৃপ্তি এসেছে যাদব চক্রবর্ত্তীর অন্তরে, সাময়িক তৃপ্তি এসেছে লতার বুভুক্ষু আত্মার আর্ত্তনাদে। আঘাতহীন দেহ তার শীতল বালু-শয্যার উপর অন্ধকারের আকাশে চন্দ্রাতপে পড়ে। আত্মা তার তখন সীমাহীন, অর্থহীন আকাশের বুকে নিজের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে লতার আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

শশাঙ্ক রায়ের এই পরিসমাপ্তির সংবাদ শুনে আরও দু'জন চমকে উঠল—একজন মথুর, দ্বিতীয় রামসিং। তাদের আবার মনে পড়ে গেল যাদব চক্রবর্ত্তীর সতর্কবাণী—"যদি কোন দিন কোন

ভাবে এঘটনার বিন্দুমাত্র তোমাদের মুখ থেকে বের হয়েছে, তবে জেন, পরদিনই তোমাদের লাস ভেসে উঠবে নবগঙ্গার চরে।” তারা জানে যে, চন্দ্র-সূর্য্যের নড়চড় হতে পারে, কিন্তু যাদব চক্রবর্ত্তীর কথার রদবদল হয় না। কয়েক দিন পরে পুলিশ রিপোর্ট দিলে যে,—“অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দ্বারা শশাঙ্ক রায় খুন হয়েছে।” হরিশঙ্করপুর গ্রাম আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। শান্ত হয়ে গেল কোণায় কোণায় চাপা আলোচনা,—ক্ষান্ত হ'ল ভীত কণ্ঠের দুর্ব্বল জিহ্বা। হরিশঙ্করপুরের দৈনন্দিন কাকলি-মুখরিত গ্রাম্য দিনগুলির ঘরে-বাইরে, মাঠে ও নদীর ঘাটে আবার ফিরে এল শান্তি। ফিরে এল দিগন্তরেখার ওপারে সেই সূর্য্যোদয়। ফিরে এল আবার শ্মশানের বুকে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়ের মাথায় সেই রক্তিম সূর্য্যাস্ত।

লতার কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ পড়বার পর জমিদার আর কোন মহল পরিদর্শনের জন্য যান নাই। যাবার সাহস হারিয়েছেন যাদব চক্রবর্ত্তী একথা বললে চক্রবর্ত্তী বংশের সাহস ও জিদের উপরে কালিমাঙ্কিত করা হয়। যাবার মত মনের অবস্থা তাঁর ছিল। মনটি যাদব চক্রবর্ত্তীর হলেও, সেটা মানুষের। তাঁর অন্তরটিতে চক্রবর্ত্তী বংশের রক্তধারার প্রবাহ থাকলেও, সে রক্তধারা মানুষের রক্ত-ধারা। সে ধারার যেমন উষ্ণতা আছে, তেমনি আর্দ্রতাও আছে। মানুষের রক্ত ও চক্রবর্ত্তী বংশের রক্ত সময়ে সময়ে সম্মুখীন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো মানুষের রক্তধারাই জয় লাভ করে।

বহুদিন পরে যাদব চক্রবর্ত্তী ঠিক করেছিলেন যে, সেদিন রাত্রে তিনি দূরে একটি মহল পরিদর্শনে যাবেন—তারই ব্যবস্থা চলছিল। মধ্য রাত্রে তিনি নৌকায় করে যাত্রা করবেন, সঙ্গে যাবে অন্য কয়েকটি নৌকায় তাঁর চাকর, খানসামা, সেজদাই বরকন্দাজ। মথুর

শুধু থাকবে বাবুর নৌকায়। দ্বিপ্রহর থেকে যাত্রার আয়োজন চলছিল।

অপরাহ্ণে জমিদার বাহিরের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসেছিলেন। এই স্থানে এই ভাবে বসে থাকা তাঁর অবসর সময়ের একটি প্রচীন অঙ্গ। আরাম কেদারার বাহুর উপরে নিজের একটি হাত নির্লিপ্তভাবে পড়ে আছে। পাশে রাখা গড়গড়াটি থেকে গয়ার তামাকের সুগন্ধি ধোঁয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলি পাকিয়ে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যাদব চক্রবর্ত্তীর চিন্তাধারাও যেন তার সাথে কুণ্ডলি পাকিয়ে মিশে যাচ্ছিল দূরের—বহুদূরের কোন অজ্ঞাত চিন্তাধারার সঙ্গে। সঙ্গতভাবে যাদব চক্রবর্ত্তী কোন চিন্তাকেই যেন পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারছিলেন না। চিন্তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে গড়গড়ার নলটিতে টান দিতে থাকেন,—ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়ে, চিন্তার গতিবিধি আরো এলোমেলো হয়ে যায়। দৃষ্টির সম্মুখে পেট-কাটা কুঠীর ভিতর দিয়ে নবগঙ্গার অনেকাংশ দেখা যাচ্ছিল। নদীর বুকের জল যেন অনেক স্থির হয়ে এসেছে। বর্ষার সে উদ্দামতা নাই, নাই বর্ষার ক্লেদসিক্ত স্রোত, ধীরে ধীরে নদীর জল স্বচ্ছ হয়ে তার আবিল্যকে অনাবিল করে আনছিল। তার মত্ততা দূর হয়ে, আসছিল গতি, আসছিল অনাবিল স্রোত। অপরাহ্ণের রক্তিমতা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকাগুলি পারাপার ক'রে আরোহীদের শান্তশ্রী ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যস্ত। কয়েকটি নৌকা গুণ টেনে এগিয়ে চলেছিল না-জানি কোন সুদূর গ্রামে। মাঝে মাঝে দু-একদল গরু রোমন্থনরত হয়ে ধীর-গতিতে এগিয়ে চলেছে ঘরের দিকে। পিছনে উলঙ্গপ্রায় রাখাল সভয়ে পার হচ্ছিল বাবুর ঘাট। বাবুর ঘাটের উপর দিয়ে যাবার সময় তাদের গতি মন্থর ও ভীত হয়ে ওঠে। লাঠির আঘাতে

গো-পালের রোমন্থন হয় বন্ধ, লেজ তুলে ইতস্ততঃ দৌড়াতে থাকে। যাদব চক্রবর্ত্তী বহুদিন এ দৃশ্য দেখেছেন, দেখে তিনি আনন্দলাভ করেছেন। বাবুর বাড়ীর সম্মুখে প্রজার এই ভীতি চক্রবর্ত্তী-বংশের রক্তধারাকে আনন্দই দিয়েছে। আজ অকস্মাৎ কেন জানি না, তাঁর দেহে মনুষ্যের রক্তধারা এ দৃশ্যে আনন্দলাভ করতে পারল না। ক্ষণিকের জন্য যেন তাঁর অন্তরে কোথায় একবার ব্যথা করতে লাগল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ব্যথা বিলীন হয়ে গেল চক্রবর্ত্তী বংশের রক্তধারার মধ্যে। পেট-কাটা কুঠীর পিছনের উঁচু ঝাউগাছটির মাথায় একটা সাদা বক যেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে বসে আছে। কেমন একটা ভয়ে যাদব চক্রবর্ত্তী চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং হাতের নলটি তাড়াতাড়ি মুখে এনে সজোরে টানতে থাকলেন। আগুন তখন প্রায় নিভে এসেছে। হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন, নদীর বুকে একখানা বড় নৌকা পাল তুলে এগিয়ে চলেছে। হাতের নল গেল পড়ে, রক্তধারা আবার তপ্ত হয়ে উঠল।

"রামসিং! রামসিং!"—প্রভুর চীৎকার শুনে রামসিং দৌড়ে এল। "তোরা কী সব মরে গেছিস্—যাদব চক্রবর্ত্তী কী মরে গেছে?" বাবুর কথা শুনে রামসিং সভয়ে আভূমি একটি প্রণাম করল।

"হুকুম, হুজুর—"

"আমি বেঁচে থাকতেই বাবুঘাট দিয়ে লোকে পাল তুলে যাচ্ছে রে—এও আমাকে চোখে দেখতে হল।" এবার রামসিং নদীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সম্যক বুঝতে পারল।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাবুঘাটের উপর নদীর কোন অংশে কোন নৌকা পাল তুলে যেতে পারত না। বাবুঘাটের সম্মুখে পৌঁছাবার আগেই তারা নৌকার পাল নামিয়ে নিত এবং বাবুঘাট পার হয়ে সে পাল আবার তোলা হত। বহুদিনের প্রথা, যাদব

চক্রবর্ত্তীর আমলেও যথারীতি প্রতিপালিত হয়। বিদেশী নৌকা নবগঙ্গায় এসেই এ সতর্কবাণী জানতে পারে অন্যান্য মাঝিদের কাছ থেকে। যে-সব বিদেশী নৌকা প্রতি বছর এদিকে ব্যবসার জন্য আসে, তারা রীতিটি জানে ও মান্য করে। যারা নতুন আসে তারা সতর্কবাণী পায় অন্যান্য নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে। বাবুর কথা শুনে রামসিং ছুটল নদীর দিকে। কিছুক্ষণ পরে দু'জন লোককে কয়েকটি সিপাহীর সাহায্যে ধরে নিয়ে উপস্থিত করল বাবুর সম্মুখে। বাবুর গড়গড়ায় তখন নতুন আগুন চড়েছে। লোক দু'টি এসে জমিদারকে সেলাম করে দাঁড়াল।

"কোথায় বাড়ী তোমাদের?"

"আরে—"

"চুপ বেয়াদপ!" এখনো কথা বলতে শেখেনি বাঁদরগুলো। "রামসিং!"—প্রভুর চীৎকারে রামসিং এগিয়ে এল বাবুর দিকে। সে বুঝতে পারল, বাবু কোথায় ভুল করেছেন। বিদেশী লোক দু'টি অকস্মাৎ এই গর্জ্জনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা না বুঝল জমিদারের ভাষা, না বুঝল সে গর্জ্জনের কারণ। শুধু এইটুকু বুঝল যে, বাঙ্গালীরা দপ করে জ্বলে ওঠে—হয়ত এইভাবেই ফুস করে নিভে যায়।

"হুজুর, ওরা আরা জেলার লোক। ওরা নিজের জিলাকে 'আরে' বলে থাকে।" রামসিং-এর কথা শুনে যাদব চক্রবর্ত্তীর হাতের নল মুখে এল, দৃষ্টি শান্ত হল।

"তোমরা আমার ঘাটের উপর দিয়ে পাল তুলে যাও, এ সাহস তোমরা কোথায় পেলে? এটা কী মগের মুলুক ভেবেছ?" বাবুর কথা রামসিং বিদেশী দু'জনকে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দিল। বিদেশী মাঝি সে গ্রামের আইনের অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে। তারা জানাল যে, "এদিকে তারা এই প্রথম এসেছে, সেই

জন্য বাবুর ঘাটের নিয়ম তারা জানত না। এবার থেকে জমিদারের নামিয়েই যাবে।” [illegible]লিত

“রামসিং! ছোট নায়েব বাবুকে বল যে, এদের কাছ থেকে দু’শ টাকা জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেবে।” বাবুর আদেশ রামসিং আবার তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। আদেশ শুনে সাহাবাদ জেলার রক্তস্রোত কিছু দ্রুত চলতে থাকল। সে রক্ত বাঙ্গালীর রক্ত নয়—তাতে তেজ আছে, শক্তি আছে ও আত্মসম্মানের জ্ঞান আছে। এ আদেশকে তারা মেনে নিতে রাজি হ’ল না, কারণ, এটা অন্যায়। ইংরাজ-সরকারের রাজ্যে নদীর ওপর পাল তুলে যাবার কোন বাধা তাদের দেশে গঙ্গায় নেই, এই ক্ষুদ্র নদীতে কী ক’রে থাকবে? জমিদারের মুখের উপর স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, “জরিমানা তারা দেবে না।” এবার যাদব চক্রবর্ত্তী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, দাঁড়িয়ে উঠলেন কেদারা ছেড়ে, ভূলুণ্ঠিত হল হাতের নল।

“রামসিং! বন্ধ কর এদের—দেখি কত বড় মরদ এরা। মথুর, শিগ্‌গির খবর দে সিপাহী ব্যারাকে—এক্ষুণি দশজন সিপাহী আসতে বল। রামসিং, দূর কর শিগ্‌গির এদের আমার সম্মুখ থেকে—বন্ধ করে রাখ যতক্ষণ না এরা পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। টাকা চাই না আমি—পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে এদের—তবে মুক্তি!” যাদব চক্রবর্ত্তী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রামসিং সে দু’জনকে বাবুর কাছে ক্ষমা চইতে বললে।

“কেয়া, মাফি মাঙ্গে? পয়ের ছুঁকে—? জান কবুল, লেকিন ই কাম হাম্‌সে না হোই।” শেষের দিকে ভোজপুরী ভাষা প্রকটিত হয়ে পড়ে। তারা জানায় যে, “দোষ করলে তারা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত, কিন্তু বিনা দোষে তারা মাথা নত করতে স্বীকৃত নয়।”

কয়েক জন সিপাহী এসে দু’জনকে ধরে নিয়ে গেল। এ

চক্রবর্ত্তীর ...স্তি সে দু'জন বিদেশী না জানলেও, সিপাহীরা জানে, নবগঙ্গ গ্রামের অন্যান্য লোকে, জানে দপ্তরের কর্ম্মচারিরা। ঘটনার ..ক্ষতা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, কানে গেল অন্দর মহলে রাণীদের। আদেশ দেবার পর যাদব চক্রবর্ত্তী বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন—ত্রস্ত পদক্ষেপ, চঞ্চল গতিবিধি। কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি আরাম চেয়ারে এসে দেহ এলিয়ে দিলেন, মথুর তামাক পালটিয়ে দিয়ে গেল।

"বাবা!"—কণ্ঠস্বরে জমিদার তাকিয়ে দেখেন, নীলকণ্ঠ দাঁড়িয়ে।

"কী রে নীলু—কিছু বলবি?" মত্ত নদীতে নিমজ্জিত প্রায় নৌকা যেন কোন সাহায্য পেল। যাদব চক্রবর্ত্তী নীলুকে ধীরে ধীরে টেনে নিলেন নিজের কাছে, বসিয়ে দিলেন আরাম-কেদারার হাতলের উপর। "কিছু বলবি নীলু?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"বল, কী বলবি? কী চাই তোর, বল না। মার নামে নালিশ নয়তো রে?"

"না, বাবা। নালিশ নয় কারো নামে।"

"তবে—?"

"বাবা, তুমি ঐ লোক দু'জনকে ছেড়ে দাও। এটা বড় অন্যায় বাবা! এদেরকে বিনা দোষে অমন শাস্তি দেওয়া অন্যায়।" নীলমাধবের কথা শুনে যাদব চক্রবর্ত্তী তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। কিশোর পুত্রের মুখের উপর যাদব চক্রবর্ত্তী অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন,—চেষ্টা করলেন তার কথাগুলোর প্রতিচ্ছবি দেখবার,—চেষ্টা করলেন কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনবার এবং চেষ্টা করলেন চক্রবর্ত্তী বংশের ভবিষ্যৎ দেখবার। চেষ্টা যেন তাঁর ব্যর্থ হল। যাদব চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টির সম্মুখে যেন একচাপ কালো অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে। সেই অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠে নিভে গেল

কয়েকটি তারা—কক্ষচ্যুত হল যেন কয়েকটি জ্যোতিষ্ক। জমিদারের হাত থেকে গড়গড়ার নলটি অজ্ঞাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—স্খলিত হয়ে পড়ল তাঁর দৃঢ়মুষ্টি হাতখানা। জ্ঞান হবার পর জমিদারীর গুরুভার হাতে নেওয়া পর্য্যন্ত যাদব চক্রবর্ত্তী এই প্রথম প্রতিবাদ শুনলেন। প্রথম স্বকর্ণে শুনলেন তাঁর কাজের বিচার এবং তার প্রতিবাদ। জীবনে প্রথম পেলেন বাধা। সে বাধা এল অন্য কারো কাছ থেকে নয়, এলো তাঁর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে। চক্রবর্ত্তী বংশের রক্তধারা মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তাঁর ধমনীতে, তীব্রবেগে ছুটতে থাকল মস্তিষ্কের দিকে, কিন্তু হঠাৎ যেন অন্তরে এসে সে ধারা পেল বাধা। ইঙ্গিত পেল অন্তরের কোন গোপন স্তরে স্থির হয়ে ফিরে যাবার জন্য। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলল রক্তধারার সঙ্গে অন্তরধারার। যাদব চক্রবর্ত্তী যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলেন। মথুর এসে তামাক পালটিয়ে দিয়ে পদসেবা করতে লাগল।

"বাবু, ডাক্তার বাবুকে কী খবর দেব? বড়-মাকে?" বাবু তাকে হাতের ইশারায় থামতে বললেন—জানালেন, "তার কোন অসুখ হয় নি।"

"নীলুকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে। বোধ হয় ভয়ে কোথাও লুকিয়েছে সে। বলিস—আমি, না, না—আমি নয়—বলিস, তোর বাবা ডাকছে।"

মথুরের সঙ্গে নীলমাধব পিতার শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। জমিদার আবার তার মুখের দিকে তাকালেন। না, বিদ্রোহের কোন ছাপ নেই তার মুখে—প্রার্থনারই ছাপ যেন। বিদ্রোহের কোন চিহ্ন দেখলে যাদব চক্রবর্ত্তী নত হতেন না, নীলমাধবেরই বন্দী হবার আদেশ দিতেন। জমিদার নিজের এই চিন্তায় যেন

সান্ত্বনা পেলেন। তিনি ধীরে ধীরে কয়েদখানার চাবির গোছা তুলে দিলেন নীলমাধবের হাতে।

"তুমি নিজে গিয়ে সেই লোক দুটোকে ছেড়ে দাও। মথুর, তুই সঙ্গে যাবি—নায়েবকে বলবি—খোকাবাবুর হুকুম, তাদের ছেড়ে দিতে—খোকা বাবুর হুকুম, বুঝলি? আমার নয়।" মথুর তার রাজা বাবুর হাত ধরে বের হয়ে গেল!

বর্ত্তমানের প্রথম জয় অতীতের উপর! প্রথম পুরুষের প্রথম বাধা মধ্যম পুরুষের কাছে। যাদব চক্রবর্ত্তী যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। আরাম কেদারায় এলায়িত নিস্তেজ যাদব চক্রবর্ত্তী দেখলেন, সম্মুখের সূর্য্যও নিস্তেজ হয়ে গেল। দ্বিপ্রহরের সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যও ম্লান হয়ে অস্ত গেল নবগঙ্গার ওপরে সেই বিরাট তেঁতুল গাছটির অন্তরালে। রক্তিম অপরাহ্ন ধীরে ধীরে আব-ছাওয়ার বুকে যেন আত্মগোপন করল। ধীরে ধীরে দীপ্ত দ্বিপ্রহরের পরিসমাপ্তি যেন যাদব চক্রবর্ত্তী নিজের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি সম্মুখে দেখতে পেলেন—তেজ কী ভাবে নিস্তেজ হয়ে আসে, এবং কী ভাবে দিনের আলোকে গ্রাস করে রাত্রির অন্ধকার। "মথুর—মথুর!" যাদব চক্রবর্ত্তী চীৎকার করে ডেকে উঠলেন তাঁর চাকরকে। কণ্ঠস্বর যেন আর্ত্তের কণ্ঠস্বর! মথুর তাড়াতাড়ি এসে গড়গড়ার কলকেটি পালটিয়ে দিল।

"ব্যাটা, তুমি জীবনে শুধু কলকে পালটাতেই শিখেছ! কলকে ছাড়্—আমার শোবার ঘরে ফরাশ বেছা, আলমারী থেকে সব ব্যবস্থা নামিয়ে দে—ফুর্তি!" বাবুর আদেশ এত জোরাল ভাবে মথুর খুব কম দিনই শোনে। যেদিন শোনে, সেদিন সে আদেশ পালন করবার জন্য—সব আদেশটুকু শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু আজ সে সবটুকু শুনেও দাঁড়িয়ে রইল্। যাদব চক্রবর্ত্তী অবাক হয়ে গেলেন!

"কী—কানে কালা হলি নাকি ?"

"বাবু, আর ও ছাইগুলো—"

"মথুর!—বাপের দেওয়া প্রাণটার ওপর কী মায়া হারালি! নীলু, তুই—সবাই আমার ওপর হুকুম চালাতে আরম্ভ করলি? বেয়াদপ্"—মথুর আর সেখানে দাঁড়াবার সাহস পেলে না।

যাদব চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তার পা-দুটো যেন আগের মত আর মাটিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে পারছে না—দুর্ব্বলতা এসে গেছে তাঁর শরীরে। সমস্ত শরীরটাকে একবার ঝাঁকিয়ে নিলেন যাদব চক্রবর্ত্তী—আহ্বান করলেন পুরাতন রক্ত-স্রোতের উদ্দামতাকে। না, কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে। ধীরে ধীরে যাদব চক্রবর্ত্তী এসে নিজের শোবার ঘরে ফরাশের ওপর বসলেন, দেখলেন, মথুর সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। মথুরকে ইসারা করলেন বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ করতে। যাদব চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিলেন সুরার পাত্র, কাতর আহ্বান জানালেন চক্রবর্ত্তী বংশের পুরাতন রক্তধারাকে আবার সতেজ হতে—আবার সচল হতে। ফিরিয়ে আনতে চাইলেন স্তিমিত অপরাহ্নে দ্বিপ্রহরের তেজ-দীপ্তি! রক্ত ধীরে ধীরে সাড়া দিল, চঞ্চল হল তার স্রোত, মরা নদীতে অকালে, অসময়ে বন্যার ডাক এল। ধীরে—অতি ধীরে যাদব চক্রবর্ত্তী জাগরিত করতে থাকলেন পূর্ব্বপুরুষের রক্তধারাকে। কিছুক্ষণ পরে যাদব চক্রবর্ত্তী যেন তাঁর নিজের পৃথিবীতে ফিরে এলেন। না, তিনি এখনো মরেন নি, যাদব চক্রবর্ত্তী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন, মথুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

"কী চাই তোর—এখানে কেন?"

"বাবু—বড়-মা একবার দেখা করতে চান।"

"মথরো, তোর গর্দ্দানটা দেখছি তোর কাছে একটা বোঝা

হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এ সময়ে আমার হুকুম ছাড়া একটা মাছিও যদি এখানে আসে—নিকাল যাও !"

গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মথুর পিছু হটতে আরম্ভ করল। সে হুঙ্কারে পিছিয়ে গেল পুরাতন মথুর, কিন্তু এগিয়ে এল খানিকটা চক্রবর্ত্তী বংশের রক্তধারা। সংবাদ শুনে বড়রাণীর আর সাহস হল না দ্বিতীয়বার অনুরোধ পাঠাবার। এ বংশের রীতি তিনি জানেন, জানেন এদের রক্তস্রোতের গতিবিধি, তার আভিজাত্য। গভীর রাত্রির আগমনের প্রারম্ভেই যাদব চক্রবর্ত্তী হয়ে এলেন স্তিমিত। ক্রমে ক্রমে তিনি ফরাশের উপরই এলিয়ে পড়লেন। মথুর ধীরে ধীরে তাঁকে ধরে শুইয়ে দিল তাঁর শয্যায়। ছোট রাণী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্না, বড়রাণী নীচে নীলমাধবকে বুকে জড়িয়ে নিজের শয্যায় জেগে। নিদ্রিত নীলমাধবের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের দেবতাকে তিনি নিজের মিনতি জানাচ্ছেন।

"বড়-মা!"

"কে রে—চন্নি ? কী খবর ?"

"বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন, মথুর খবর দিল। মথুর তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, এবার তুই শুতে যা। মথুরকে বলে দে, বাবুর মাথার কাছে জল যেন ঠিক থাকে—আর শোন, মথুরকে আজ দরজার কাছেই শুতে বল!" বড়রাণী যুক্তকরে দেবতাকে প্রণাম করলেন, নিজের বুকে চেপে ধরলেন নীলমাধবকে—ভবিষ্যতকে!

পরদিন জমিদার জাগলেন নূতন জীবন নিয়ে, জাগলেন যেন পুনরায় যাদব চক্রবর্ত্তী-রূপে, বাংলার নিজস্ব জমিদাররূপে—আর সমস্ত রূপ, সমস্ত রং এবং সমস্ত গন্ধ নিয়ে। সেদিন সকাল-বেলাতেই তিনি দপ্তরে খবর পাঠালেন যে, "সেদিন থেকে তিনি নিজেই প্রত্যহ দপ্তরে গিয়ে বসবেন।" সংবাদটি দপ্তরে গিয়ে

দুঃসংবাদের মত পৌঁছল। ত্রস্ত হলো সকলে—চিন্তিত হ'ল অনেকে। অনেক আমলা ব্যাপারটিকে মোটেই আমল দিলেন না,—চাপা স্বরে পাশের লোককে বলেন—"আরে এ বাবুর দু'দিনের সখ, আবার দু'দিনেই নিভে যাবে। এমন অনেকবার হয়েছে।" কেবল একটিমাত্র লোক খুশি হ'ল, সে ম্যানেজার তাফু মিঞা। চক্রবর্ত্তী বংশের প্রধান হিতৈষী নায়েব তাফু মিঞা বহুদিন থেকেই মালিককে বলছেন,—নিজে মাঝে মাঝে দপ্তরে বসতে। তাতে দপ্তরের দড়িতে টান থাকে, একটা যোগসূত্র থাকে জমিদারে ও জমিদারিতে।

পেট-কাটা ঘরের দপ্তরে বাবুর ঘরটি আবার সুসজ্জিত হল। ফরাশের ও তাকিয়ার ওয়াড় গেল বদলে, ঝাড় লণ্ঠনের ধূলা পরিষ্কার করে তাতে আবার নতুন বাতি বসান হ'ল। রূপার ফুলদানিগুলোর ওপর—বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে তরুণ অরুণের নূতন আলো এসে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। মালী তৎপর হল—ফুলের তোড়া ভরে দিল তাতে। তাকিয়ার ওপর ঝুলিয়ে দিল সুগন্ধযুক্ত ফুলের মালা। মথুর রূপার গড়গড়াটি যথাস্থানে রেখে নিজের আসন বেছে নিল আবার।

জমিদার এসে আবার দপ্তরে বসলেন। পাশের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রবাহবতী নবগঙ্গা, তার দু'পারের বালুর চর, দুপারে বাঁধা ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। এপারে একটা বাঁশের খুঁটির উপর একটি সাদা বক বিক্ষিপ্তভাবে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন যাদব চক্রবর্ত্তী। পাশের আকাশচুম্বী ঝাউ গাছটির বাতাসের সঙ্গে কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বাবুর ঘর থেকে। ঝির ঝির করে বাতাস এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে। মাঝে মাঝে এসে পড়ছে জমিদারের ঘরে সাহস করে তার কয়েকটা চাপ। পেট-কাটা কুঠুরীর মাঝখান থেকে লাল পথটি বাবুর

ঘাটের বুকের ওপর গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। সেটা পড়ে আছে সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদূরের মত। ঘাটের সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে থরে থরে নদীর বুকে। কতদিনের দেখা সব—তবুও যেন আজ এগুলো যাদব চক্রবর্ত্তীর কাছে নতুন বলে মনে হ'ল। আজ যেন তিনি প্রথম জমিদার হলেন। কর্ম্মচারীরা একে একে এসে বাবুকে প্রণাম জানিয়ে গেল। প্রবেশ, প্রণতি ও প্রস্থান—কেউ চতুর্থ অধ্যায়ের সাহস পেলনা, হয় ত রীতিও ছিল না। জমিদার কথা না বললে তাদের কথা বলার নিয়ম নাই, জমিদার প্রয়োজন ব্যতীত কর্ম্মচারীর সঙ্গে কথা কম বলতেন। সর্ব্বশেষে এলেন তাফু মিঞা। জমিদার তাকে বসতে বললেন।

"বসুন, কাকাবাবু! খবর সব ভাল ত ?"

"আপনার মেহেরবাণীতে সবই কুশল বাবু। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন।"

"কেন ?"

"বাবু, কতদিন আপনাকে দপ্তরে এসে বসতে বলেছি। আপনাকে কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছি, সেই দাবীতেই বলি বাবু—এটা দরকার। রাজা দূরে থাকলে রাজত্ব চলে না, পেরজারা আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়—আমলার হুকুম বাড়ে—"

"তাতে ত আমলাদের খুসী হওয়াই উচিত কাকাবাবু!"

"তা হয়, আমলারাও তাই চায়—কিন্তু তাফু মিঞা সেটা বরদাস্ত করতে পারে না বাবু। দূরের রাজার রাজত্বিতে ভাঙ্গন ধরে ধীরে ধীরে হুজুর—!"

"আমলারা ঠিক থাকলে হয় না কাকাবাবু—ইংরেজ রাজত্ব দেখুন।"

"দেখেছি বাবু—তবে এর শেষ দেখতে পারব না, এই দুঃখ্যু। তবে জানি বড় বড় বাদশার মিনার ভেঙ্গেছে এই দোষে। রাজায়-

পে-জায় সাক্ষাৎ থাকা দরকার বাবু। তার মাঝে আমলারা জায়গা নেবে!" যাদব চক্রবর্ত্তী একবার যেন চমকে উঠলেন। বহুদিন পরে তিনি যেন খাঁটি কথা শুনলেন।

"মথুর—" মথুর তাড়াতাড়ি এসে কলকেটা পাল্‌টিয়ে দিল। "ছোট নায়েব বাবুকে খবর দে।" যাদব চক্রবর্ত্তীর নতুন কলিকায় তখন নতুন আগুন জ্বলে উঠেছে, গড়গড়াটিতে দু'একটা টান দিতেই কয়েকটি চক্রাকার ধোঁয়া মিলিয়ে গেল ঘরের হাওয়ায়। ছোট নায়েব এসে আভূমি প্রণিপাত করে দাঁড়াল।

"পাল মশায়! প্রজাদের যা আর্জ্জি সব আমি নিজে শুনব। তাদেরকে এখানে এক এক করে পাঠিয়ে দেবেন। রোজ সকালে এই ব্যবস্থাই থাকবে। দেখবেন, যেন কোথাও তারা বাধা না পায়!" পাল মশায় দ্বিতীয়বার প্রণিপাত করে সম্মতি জানাল। "আচ্ছা, আপনি যান।" নিঃশব্দে পাল মশায় বেরিয়ে গেলেন। তাফু মিঞা জমিদারের অনুমতি নিয়ে নিজের দপ্তরে চলে গেলেন।

জমিদার চিন্তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মালা গেঁথে যেতে লাগলেন। যাদব চক্রবর্ত্তী তাকিয়ে দেখলেন, বকটি ঠিক সেইভাবেই বসে আছে। ধ্যানমগ্ন বক, কি শিকারমগ্ন বক ঠিক বোঝা গেল না। ঘরের পাশ থেকে কয়েকটি দেশী ফুলের গন্ধ এসে জমিদারের তামাকের উগ্রতাকে নম্র করবার চেষ্টা করছে। এমন সময় বাহিরে একটা চাপা গোলমাল শোনা গেল। সিপাহীর তীব্র কণ্ঠস্বরকে কে যেন চাপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জমিদার ক্ষণিকের জন্য সেদিকে মন দিয়ে গড়গড়ায় টান দিলেন—নিজের মস্তিষ্ককে কড়া তামাকের উগ্রতায় কিছু সতেজ করবার জন্য। এমন সময় পাল মশায় ঘরে প্রবেশ করলেন যুক্ত করে, নত মস্তকে।

"কিসের গোলমাল পাল মশায়?"

"হুজুর, একজন প্রজা এসেছে—!"

"নিজেই এসেছে—না ধরে এনেছো ?"

"হুজুর, ধরে ঠিক নয়—তবে ডেকে আনা হয়েছে। বার বছরের খাজনা বাকি, হুজুরের হুকুম মত আট বছরের মাফ্ দেওয়া হয়েছে —কিন্তু চার বছর তবুও বাকি—সামনে তামাদি আসছে—"

"ডাকুন ওকে—" পাল মশায় গিয়ে একটি লোককে ডেকে আনলেন। লোকটি বাবুর দুয়ারের কাছে এসে আভূমি প্রণিপাত করে দ্বারের ধূলি তুলে নিজের জিহ্বায় ঠেকাল ও পরে মাথায় ও বুকে স্পর্শ করলে—যেমন লোকে মন্দিরের দুয়ারে করে। পরণে একটি ছিন্ন বাস ছাড়া সমস্ত দেহ নগ্ন। তৈলহীন কেশবিরল মাথাটি দেহের আকারে বড়। বুকের হাড়গুলি প্রকটিত হয়ে বাংলার কৃষকদের স্বাস্থ্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে। যাদব চক্রবর্ত্তী নিজের শাসনের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

"ওকে রেখে আপনি যেতে পারেন পাল মশায়।" প্রজাকে রেখে পাল মশায় ভীত পদে প্রস্থান করলেন বটে, কিন্তু মনটি যেন পিছনেই পড়ে থাকল।

"কতদিনের খাজনা তোর বাকি ?"

"হুজুর—বাকি পড়েছে বার বছরের। বছর বছর কিছু দিয়্যা যাই বাবু, তবে সবটা দিতে পারি নি, তাই বাকি পড়ে থাকে।"

"কেন দিতে পারিস নি—খাজনা বাকি রাখা তোদের একটা বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে। বার বছর ত এক যুগ হ'ল রে!

"মথুর!"—এ ডাকে প্রজাটি শিশুর মত কেঁদে উঠল, ভাবল, সে ডাকের অর্থ শাস্তির ব্যবস্থা। মথুরকে বাবু তামাক পালটে দিতে বললেন। প্রজাটিকে প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারলেন যে, খাজনা সে প্রায় প্রতি বছরই দিয়ে যায় কিন্তু সেরেস্তার সেলামী তা থেকে আসে না বলে সবটা সেলামীতেই কেটে যায় এবং খাজনা যথারীতি

বাকিই থেকে যায়। প্রথম কয়েক বছর বন্যাই তার ভাগ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গত বছর তার ডবকা ছেলেটা দমকা হয়ে মারা যাওয়ায় চাষের কাজ প্রায় বন্ধই ছিল। এই সব কাহিনী বর্ণনা করতে করতে প্রজাটি আবার শিশুর মত কেঁদে উঠল—তার তৈরী পুত্রের স্মৃতিতে, এবং তার তৈরী ক্ষেতের নষ্ট ফসলের স্মৃতিতে। বাংলার কৃষকের কাছে কোনটি বেশী মর্ম্মান্তিক কে জানে!

"তোর আর ছেলে নেই?—"

"আর একটি ছ্যামরা আছে বাবু—এই আমাগো রাজা বাবুর সমান—অর্থাৎ নীলমাধবের সমান। সেটারও কিছু ঠিক নেই বাবু, সব সময় ভুগতিই থাকে—ভুগতিই থাকে।" তার আশাও সে করে না। সকলে আশা করে কিন্তু বাংলার কৃষকের আশা বলে কিছু নাই। নীলমাধবের উপর যাদব চক্রবর্ত্তী কত আশা করে বসে আছেন অথচ তাঁর প্রজা তার পুত্রের উপর কোন আশাই স্থাপন করতে পারে না—পারবার শক্তি, সাহস এবং ইচ্ছাও তার নাই। যাদব চক্রবর্ত্তী পাল মশায়কে ডেকে প্রজাটির সমস্ত খাজনা মাফ করে দেবার আদেশ দিলেন এবং আরও আদেশ দিলেন যে আগামী চার বছর তার কাছে আর তাগিদ যেন না হয়।

"সামনের চার বছরের খাজনাও মাফ লিখে রাখব হুজুর?—"

"না! সব মাফ্ দিলে এদিকে আমারও যে সাফ্ হয়ে যাবে—আপনারাও সাফ্ হয়ে যাবেন। তাগিদ দেখ না। ওর ছেলে যখন লাঙ্গল ধরতে পারবে—তখন ও আপনি দিয়ে যাবে—যান!" পাল মশায় যেতে যেতে ভাবলেন, এমন হুকুম আরও কয়েকটি হলে তাঁদের ভবিষ্যৎটিও অন্ধকার হয়ে যাবে। খাজনার চেয়ে তাদের খাজা ও খানা বেশী দরকার। যাদব চক্রবর্ত্তী মথুরকে তামাক বদলিয়ে দেবার আদেশ করলেন। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, বকটি উড়ে গেছে কোন অজ্ঞাত স্থানে, তার জায়গায় একটা কালো

কাক এসে বসেছে—সে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু! তার কাছে না আছে বকের রং, না আছে বকের স্বভাব। জমিদারের চিন্তার জাল উর্ণনাভের মত বোনা হয়ে যাচ্ছিল। তার জটিলতা জটিলতর হয়ে চলেছিল স্বচ্ছ ধোঁয়ার কুণ্ডলী শ্রেণীতে। একটি মিলিয়ে যাচ্ছিল হাওয়ায়, আর একটি গুমরে মরছিল মনে। যাদব চক্রবর্ত্তী যখন তার জটিলতায় মগ্ন হয়ে আনন্দ পাচ্ছিলেন, সেই সময় তাফু মিঞা তার ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন। চিন্তার হাত থেকে যেন রক্ষা পেলেন যাদব চক্রবর্ত্তী।

"কিছু বলবেন কাকাবাবু!—"

"হাঁ বাবু—একটা বড় খারাপ খবর আছে।"

"খারাপ খবর?"— বাবুর হাত থেকে নলটি ফরাশের উপর পড়ে গেল। "কী খবর?"—উৎকণ্ঠার স্বর তাঁর!

"কাল রাত্তিরে কাৎলাখালিতে আগুন লেগে গাঁয়ের অর্দ্ধেকটা শুনছি ছাই হয়ে গেছে—হুকুম হয় ত একবার যাই সেখানে"—

"আগুন!—এমন আগুন? অর্দ্ধেকটা ছাই হয়ে গেছে—?" জমিদার গড়গড়ার নলটি আবার হাতে তুলে টানতে লাগলেন, সে আগুনও ততক্ষণে ছাই হয়ে গেছে। "হুকুমের অপেক্ষায় আছেন এখনও কাকাবাবু—এক্ষুনি যান—আচ্ছা, আমারও যাবার ব্যবস্থা করুন, আমিও যাব।" মথুর এসে গড়গড়ার কলকেটিতে হাত দিতেই জমিদার চীৎকার করে উঠলেন।" ব্যাটা খালি কলকে পালটাতেই জান। "যা—আমার স্নানের ব্যবস্থা কর, কাৎলাখালি যাব।"

দ্বিপ্রহরে যাদব চক্রবর্ত্তী কাৎলাখালি গ্রামে পৌছলেন। গ্রামটি নবগঙ্গার অপর পারে ক্রোশ দুই দূরে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। সেখানে চক্রবর্ত্তী বংশের বাছা বাছা প্রজার বাড়ী। কাৎলাখালি মুসলমান প্রধান গ্রাম হলেও যাদব চক্রবর্ত্তীর প্রিয় মহাল সেটি।

সেখানে জমিদারের একটি নাতিবৃহৎ কাছারী বাড়ী ও কয়েকটি গোলা আছে। যাদব চক্রবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখলেন, সে দৃশ্য তাকে স্তম্ভিত করে দিল। গ্রামের আকাশ বাতাস তখনও যেন কালিমালিপ্ত—আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। সে কালিমার চিহ্ন তখনও লেগেছিল প্রতি মুখে, সে কালিমা তখনও কাঁপাচ্ছিল গাছের পাতাকে, আলোড়িত করছিল গ্রামের সমস্ত আবহাওয়াকে। একদা-সমৃদ্ধ গ্রামের অধিকাংশই ধূলি-লুণ্ঠিত হয়েছে। ধূলি-লুণ্ঠিত হয়েছে গ্রামের আশা ও উৎসব—ধূলি-লুণ্ঠিত হয়েছে কল-কাকলি,—এক হয়ে গেছে গ্রামের নিজস্ব কলহ ও ঈর্ষ্যা। সকলকে এক করে দিয়েছে হুতাশন। ধনী ও দরিদ্রকে একত্র করেছে ব্রহ্মার রোষ-দৃষ্টি। এক রাত্রে প্রচারিত হয়েছে সাম্যবাদ। মাঠে মাঠে ধনী দরিদ্র, শত্রু মিত্র, মানুষ ও পশু একই আচ্ছাদন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ভুলে গেছে প্রভেদ, ভুলে গেছে পার্থক্য। চোখের জলে পবিত্র করে দিয়েছে,—শান্ত করে দিয়েছে গ্রামের সনাতনী ঈর্ষ্যা কোলাহল। পশু তাকিয়ে আছে মানুষের দিকে, মানুষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আকাশ যেন অন্ধ হয়ে গেছে, অর্থহীন হয়ে গেছে। গ্রামের বুকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দগ্ধ বাঁশের ছাই, অর্দ্ধদগ্ধ বাঁশ ও অর্দ্ধদগ্ধ গরু-ছাগল-মুর্গীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ডের রেশ তখনও যেন তাণ্ডবলীলার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

সেই শ্মশানের বুকে আকাশের দিকে ইসারা করে দাঁড়িয়ে আছে পাকা মসজিদটি ও তারই অদূরবর্ত্তী কালী মন্দিরটি। তাদের মাথার পতাকা দু'টি হাওয়ার বুকে ইঙ্গিত করে চলেছে একই দিকে। কাছারীর বারান্দায় বসে যাদব চক্রবর্ত্তী সেই দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জমিদারের আগমনের সংবাদ শুনে গ্রামের প্রজারা দলে দলে তাঁকে প্রণাম জানাতে এলো। এই মর্ম্মন্তুদ

আবহাওয়ার বুকেও প্রজারা তাদের সনাতনী সংস্কার ভুলে নাই, ভুলে নাই তাদের রক্ত-প্রবাহকে। পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, জমিদারের সঙ্গে দেখা করা শূন্য হাতে হত না, প্রণাম করে কিছু প্রণামী পায়ের কাছে না রাখলে, শুধু জমিদারকে নয়, নিজের বংশকেও অপমান করা হত। তাই সাধ্যানুযায়ী প্রণামীর ব্যবস্থা ছিল। সেদিনের সেই বিপদেও প্রজারা শূন্য হাতে রাজদর্শনে আসে নি, পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী পূর্ণ নৈবেদ্য না হলেও, সে ডালি শূন্য ছিল না। বিপদ বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী। সে সকলকে এক মুহূর্ত্তে একই সমতলে দাঁড় করিয়ে দেয়, মুহূর্ত্তে ভুলিয়ে দেয় পূর্ব্বের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পার্থক্য। আগত প্রজাদের মুখ দেখে মনে হল যেন সকলেই একই ঘরের সদস্য—একই অবস্থার দাস! গ্রামের মাতব্বর কাসেম এসে যখন জমিদারের পদবন্দনা করল, তখন তার অশ্রুধারা ভিজিয়ে দিল জমিদারের শুষ্ক চরণকে। পায়ে সে স্পর্শ যাদব চক্রবর্ত্তীর মস্তিষ্কের সব চিন্তাকে যেন জট পাকিয়ে দিল। যাদব চক্রবর্ত্তী ক্ষিপ্রহস্তে কাশেম সর্দ্দারকে তুলে বসিয়ে দিলেন অদূরের চৌকির ওপর। যাদব চক্রবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত কোন প্রজাকে স্পর্শ করেন নি। প্রজার এই প্রথম স্পর্শ রাজায়-প্রজায় প্রথম সেতু বন্ধন করল। কাসেমের মুখে ধীরে ধীরে জমিদার হুতাশনের তাণ্ডব লীলার বিস্তারিত ইতিহাস শুনতে শুনতে কেমন যেন বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন—হাতে মুষ্টিবদ্ধ গড়গড়ার নল, পাশে ভস্মীভূত গড়গড়ার কলকে, সম্মুখে ভস্মীভূত একদা-সমৃদ্ধ গ্রাম। এবং মনের মধ্যে সে গ্রামকে গড়ে তুলবার কল্পনা। জমিদার অভ্যাস বশতঃ নলটি মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাওয়ায় আত্ম-প্রকাশ না করলেও, যাদব চক্রবর্ত্তীর চিন্তার কুণ্ডলী জাল বয়ন করতে থাকল। জমিদার নিজের মনে গড়গড়া টানতে থাকলেন—যেন অবচেতন-

ভাবে। তাফু মিঞার ইঙ্গিতে মথুর কলকেটি পালটিয়ে দিল। বাহিরের পৃথিবীতেও ধোঁয়ার কুণ্ডলী আত্মপ্রকাশ করল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করবার পর যাদব চক্রবর্ত্তী তার চোখ খুললেন। চোখ খুলে যেন নতুন পৃথিবী দেখলেন তিনি দৃষ্টির সম্মুখে। দেখলেন, সম্মুখের বিস্তীর্ণ শূন্যস্থান প্রজায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে,—সকলেই তাকিয়ে আছে সেই নতুন পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য। চোখের এক কোণে অশ্রুধারা, অন্য কোণে আশার দীপ্তি।

"কাকাবাবু!—"

"হুজুর!"—অদূরে উপবিষ্ট তাফু মিঞা সচকিত হ'য়ে উঠলেন।

"এই কাৎলাখালীকে আবার গড়ে তোলবার ভার আপনার উপর দিলাম। তিনমাস পরে আমি আবার এখানে আসব, তখন আমি দেখতে চাই যে, কাৎলাখালি এমন খালি নেই, সে আগের মত মাথা তুলে আছে, তার ঘরে ঘরে আবার হাসির বন্যা বয়ে যাচ্ছে!" নিমীলিত চোখে যাদব চক্রবর্ত্তী যেন কাৎলাখালির পুনরুত্থান দেখলেন। সামান্য সময়ে সেই গুরুভার পেয়ে তাফু মিঞা যেন ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো, সে একবার তাকাল কাশেম মিঞার দিকে।

"আমাদের সব জোল খুলে দিন, এবং প্রত্যেক প্রজাকে পাঁচ মণ করে ধান দিন, এখানকার গোলার ধানে না কুলালে অন্য গোলা থেকে আনিয়ে নিন, আমার খড়ের জমি থেকে যার যা খড় দরকার, আমার বাঁশঝাড় থেকে যার যা বাঁশ দরকার কেটে নেবে। আজ পর্য্যন্ত যত খাজনা বাকি আছে সব মাফ লিখে দিন ও আমাদের খাস জমি যাদের অধিকারে তাদেরকে বলে দিন, এ বছর ফসলের ভাগ দিতে হবে না। সকলকে বুঝিয়ে দিন—কিন্তু সব চেয়ে আগে বুঝিয়ে দিন আপনার সিপাহীদের আর আপনার আমলাদের। তাদেরকে বলে দিন, এ বছর যেন তারা কাৎলাখালিকে ক্ষমা করে।"

শেষের দিকে যাদব চক্রবর্ত্তী যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। তখনও তাঁর রক্তধারা যেন স্তিমিত প্রবাহে স্মরণ করবার চেষ্টা করল পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকে ও তার ঔদার্য্যকে। এমন সময় একজন নগ্নপ্রায় লোক এসে জমিদারের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কেঁদে উঠল শিশুর মত, আর্ত্তনাদ করে উঠল ক্ষিপ্তের মত। যাদব চক্রবর্ত্তী আবার যেন নিস্তেজ হয়ে গেলেন, আবার যেন ফিরে এলেন কালিমা-লিপ্ত ভস্মীভূত কাৎলাখালিতে। নাসিরের কাহিনী আরও মর্ম্মান্তিক। তার মেয়ের বিবাহ সিরাজের ছেলের সঙ্গে ঠিক হয়ে আগামী শুক্রবার দিনস্থির হয়ে থাকে। ঘরে ছিল বিবাহের যাবতীয় বস্ত্র ও অলংকার। নাসিরের সচ্ছল অবস্থার অহংকার এক ফুৎকারে সব একাকার হয়ে একই ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। নাসিরের অবস্থা দেখে বোঝা যায় না যে, একদিন আগেও তার অবস্থা অনেকের ঈর্ষ্যার বস্তু ছিল।

"তাতে কি হয়েছে নাসির! তোমার মেয়ের বিয়ে ঐ দিনই হবে, না হবার কী আছে?"

"হুজুর—সব ছাই হইয়্যা গ্যাছে, সব ছাই হইয়্যা গ্যাছে—সিরাজ আর রাজি হবেনে, তার ছামরার সাদি অন্য জায়গায় দিবে—আমার বেটির সঙ্গে আর দিবেনে—আমার বেটির কী দশা হবে রাজা বাবু?"—নাসির আবার পাগলের মত কেঁদে উঠল। পরিচয় নিয়ে জমিদার জানতে পারলেন যে, সিরাজ পাশের রুই-কাৎলা গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ও জমিদারের মণ্ডল। যাদব চক্রবর্ত্তীর আদেশে বরকন্দাজ ছুটল তাকে ডেকে আনবার জন্য।

"শোন নাসির!—তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হবে, আর ঐ দিনই হবে। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, এর অর্দ্ধেক আমার তরফ থেকে তোমার মেয়েকে দিলাম, আর অর্দ্ধেক তোমাকে ধার দিলাম—সুদ চাই নে, তোমার যখন সাধ্য

হবে শোধ করো। তোমার অবস্থা অবার ভাল হবে। হ্যাঁ, দ্দিকে। শুক্কুরবারে আমি নিজে আসব তোমার মেয়ের বিয়েতে।" নাসিক্কির আবার রাজার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। এ অশ্রু মুক্তির অশ্রু। কিছুক্ষণ পর সিরাজ এসে জমিদারকে প্রণাম জানাল।

"সিরাজ!—তোমার ছেলের সঙ্গে নাসিরের মেয়ের বিয়ে ঐ শুক্কুরবারেই হবে—তুমি সব ঠিক ঠাক কর।"

সিরাজ বিনীতভাবে তার প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করল। যাদব চক্রবর্ত্তী আবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন।

"শোন সিরাজ!—কাৎলাখালির দিকে তাকিয়ে দেখ, রুই-কাৎলা বেশী দূর নয়, তোমার দেমাককে নিভিয়ে দিতে যাদব চক্রবর্ত্তীর একটা মাত্র ফুঁ লাগবে, এটা মনে রেখো—এ-বিয়ে হবেই। আমি নিজে সেদিন বিয়েতে আসব মনে রেখ।"

সিরাজের অনিচ্ছাকে কে যেন গলা টিপে ধরল। তার সব ভাষা যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। সে জানে তার জমিদারকে, সে দেখেছে যাদব চক্রবর্ত্তীর রোষবহ্নি, সে বহ্নি তার সংসারকে কাৎলাখালির মত ভস্মীভূত করতে অল্পতর সময়ই নেবে।

"তোমার ছেলেটা শুনলাম গত বছর ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছে?"

"হ্যাঁ হুজুর—আপনার ছিচরণের কিরপায়—"

"বেশ কথা,—সন্ধ্যের পর নাসিরের জামাইকে আমার এই কাছারীতে চাকরী দেবার হুকুম আমি আজই দিয়ে যাচ্ছি।" এবার সিরাজ যাদব চক্রবর্ত্তীর পা চেপে ধরল। সিরাজ ও নাসির একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

অদূরে মসজিদ ও মন্দিরের পতাকা দু'টি একই দিকে তখন ইঙ্গিত জানাচ্ছে। যাদব চক্রবর্ত্তী স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় জমিদার তার বাহিরের বারান্দায় আরাম

শুয়ে বসেছিলেন। দৃষ্টি সম্মুখের ঝাউগাছটির দিকে আবদ্ধ। তাঁর হাতে গড়গড়ার নলটি অবহেলিতভাবে ধরা। কখনো কখনো সেটি মুখে উঠছে, তখন দু-একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আত্মপ্রকাশ করছে। যাদব চক্রবর্ত্তী দেখেন, সেই কুণ্ডলীগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিজেকে সম্মুখের হাওয়ার বুকে। ঝাউগাছের মাথায় অপরাহ্নের শেষ নিস্তেজ করুণ আলোটুকু এক ঝাঁক কাকের পাখায় লেগে চিকচিক করছে। কাকগুলো চঞ্চলভাবে চতুর্দ্দিকে তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে দু-একটা কিছুদূর যাচ্ছে উড়ে, আবার এসে দলে মিশে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা ত্রস্ত ভাব তাদের। তাদের দল থেকে যেন স্বতন্ত্রভাবে একটা বক খুব উঁচু একটা ডালে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। কাকের জাতির উপর যেন একটা কেমন বিতৃষ্ণা ভাব, সে যেন উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী, সে যেন জাতিতে ব্রাহ্মণ তাই অবহেলার ভাব বর্ণশঙ্কর কাকের প্রতি। নদীর বুকের উপর আকাশ যেন অনেক নীচু হয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখবার চেষ্টা করছে। বর্ষার প্রারম্ভে নবগঙ্গা তার লুপ্ত যৌবনের ডাক শুনেছে। দেহে লেগেছে স্বাস্থ্যের সাড়া, রোখায়িত হয়েছে দেহের অঙ্গগুলি, সতেজ হয়েছে রক্ত প্রবাহ, দোলা লেগেছে বুকের রক্তে। সেই বুকে ঝুঁকে পড়ে আকাশ দেখতে চায় নিজের প্রতি-চ্ছবি—যৌবন বন্যার সাহায্য করতে চায়। চাপ চাপ মেঘ মাঝে মাঝে দু'জনকে আড়াল করে ভেসে চলেছে উত্তরের দিকে। থেকে থেকে কয়েকটি মেঘের চাপ এক হয়ে যাচ্ছে, আবার তারা হয়ে যাচ্ছে পৃথক। এ আয়োজন বর্ষার,—এ আয়োজন বর্ষণের। দিকে দিকে চলেছে এই বর্ষণের ও ঘর্ষণের আয়োজন। দূরের তাল গাছটি ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে নদীর বুকের উপর, তারও প্রচেষ্টা যেন নদীর বুকে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখবার। গাছটির মাথায় বহু বাবুই পাখীর বাসা দুলছে হাওয়ায়, দুলছে আকাশের বুকে, দুলছে নদীর জলের বুকে।

বাবুই পাখীগুলি অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি করছে চতুর্দ্দিকে। ক্রমাগত তারা নিজের বাসায় ঢুকছে আর বের হচ্ছে, এবং কিচির মিচির শব্দে জাগরিত করে তুলেছে গাছটির মাথাকে। সে শব্দে বিরক্ত হচ্ছে কাকের দল কিন্তু ঝাউ গাছের বকটি নির্লিপ্ত চিত্তে একই দিকে তাকিয়ে আছে। জমিদারের বাড়ীর সম্মুখের বাগান থেকে ভেসে আসছে কয়েকটি দেশী ফুলের গন্ধ। পেটকাটা ঘরের পাশ থেকে ভেসে আসছে গ্রাম্য বন্য ফুলের উগ্র গন্ধ, ভেসে আসছে বাংলার গ্রামের নিজস্ব ঘ্রাণ ও নিজস্ব প্রাণ। নদীতে যাবার পথের নীচে আঁঠেলের বন ঘন হয়ে উঠেছে প্রথম বর্ষার বর্ষণে। সিপাহীদের ঘরের নীচু ছাদে ঝিঙ্গে লতার পাতায় পাতায় ফুল ফুটে উঠেছে। ঝিঙ্গের ফুল ফোটা গ্রামের সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে। চারিদিকে বেজে উঠল শঙ্খের ধ্বনি। মথুর এসে বাবুর ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। পুরোহিত এসে পূজা মণ্ডপে সন্ধ্যা-বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। যাদব চক্রবর্ত্তী কেমন যেন নিস্তেজ হ'য়ে পড়লেন সন্ধ্যার স্পর্শে। তিনি তপ্ত দ্বিপ্রহর ভাল বাসেন—ভালবাসেন পূর্ণ যৌবনের জ্বালা।

"মথুর!—" মথুর এসে তামাক পালটিয়ে দিল। অন্য সময় মথুর তামাক বদলে দিয়েই চলে যায় কিন্তু তখন সে সেখানে দাঁড়িয়েই থাকল, দাঁড়িয়ে থাকল এমনভাবে, যেন সে কিছু বলবে।

"কী রে মথুর, কিছু বলবি! টাকার দরকার নাকি! কাল বড়-মার কাছ থেকে চেয়ে নিস।"

"না বাবু—টাকার দরকার নেই। তবে—"

"তবে কী?—ছুটি চাস? ছুটি এখন হবে না।"

"না বাবু, ছুটি চাইনে—"

"তবে কি আমার মাথা চাস—যা বলবি তাড়াতাড়ি বল।"

"একটা কথা বলব বাবু?—"

"নিশ্চয়ই বলবে—সেটার জন্যই তো আমি এত মাথা কুটছি!"

মথুর চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বলল, "বাবু, রামসিং-এর মতিগতি আমার কেমন ভাল লাগছে না। সেইদিন—সেই আরা জেলার লোকগুলোর উপর সাজা দেবার পর থেকেই রামসিং যেন একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে—"

"কেন, তাতে তার কী?"

"নিজের দেশের লোক কি না। তাতে নাকি তার খুব অপমান হয়েছে। ও একদিন কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল, তা আমি শুনেছি বাবু। দেশের লোকের অপমান—সে নাকি তার বুকে বিঁধেছে, চাকরী আর ও করবে না হয়ত। বলছিল বাবুর পরাণ-কাটি তার হাতে আছে। দরকার হলে সে প্রতিশোধ নেবে—আপনি তো সব জানেন বাবু—!" মথুর বলতে বলতে শিশুর মত কেঁদে উঠলো। যাদব চক্রবর্ত্তী সম্মুখে তাকিয়ে দেখলেন, সন্ধ্যা ঘিরে ফেলেছে সমস্ত গ্রামটাকে। পেট-কাটা ঘরের মাথায় পাহারার আলো টাঙ্গান হয়েছে, আলোটি যেন জমিদারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

"আর কেউ জানে এ-কথা—আর কেউ শুনেছে কি রামসিং-এর এই হুমকি?

"না—বাবু—।"

"ও নেবে প্রতিশোধ! মথুর, ফরাশ বেছা।" এ হুকুমের অর্থ মথুর জানে, সে চেষ্টা করে বাবুকে বিরত করবার।

"বাবু—"

"হারামজাদা—কথা দুবার বলতে হবে?—" মথুর দ্বিতীয় বার প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। মথুর চলে যাবার পরই তাফু মিঞা এসে উপস্থিত হল। এমন সময়ে তাফু মিঞা সাধারণতঃ

আসে না, আসে তখনই—যখন খুব বিশেষ দরকারী বা গোপনীয় কথা থাকে।

"আসুন, কাকবাবু—এমন সময়ে যে, খবর সব ভাল তো ?" আজ জমিদার তাঁর আগমনকে বিশেষ আদরণীয় মনে করলেন না।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, খোদার দোয়ায় সব ভাল। একটা কথা বলবার ছিল হুজুর—বিশেষ দরকারী, তা না হ'লে এমন সময়—

আবার দরকারী কথা! আজ কী শুধু অশুভ সংবাদই শুনবেন তিনি।

"বলুন—বলুন, কী বলবার আছে। আজ আমি নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছি কাকাবাবু।"

জমিদারের কথা ম্যানেজার ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাফু মিঞা একবার চারিদিক তাকাল, তাঁর মনে হল যেন দেওয়ালে কে কান পেতে আছে।

"বাবু, একটু ঘরের ভিতর গেলে ভাল হত—এখানে—"

"ওঃ, আচ্ছা। মথুর, ফরাস পেতেছিস্ ? চলুন।" ঘরের ভিতরে ফরাস পাতা। তার উপর রাখা গেলাস, সোডার বোতল ও সুরা। জমিদার ফরাসে বসে সেগুলি পিছনে সরিয়ে রাখলেন। জমিদার যে সুরা পান করেন ম্যানেজার তা জানে। কিন্তু যাদব চক্রবর্ত্তী তাফু মিঞার সামনে কোনদিন সুরাপান করেন না। এ সম্মান তাফু মিঞার প্রাপ্য।

"বসুন, ফরাসে বসুন কাকাবাবু—" ম্যানেজার ইতস্ততঃ করতে লাগল। "বসুন—এখানে আপনি আমার শ্রদ্ধেয় লোক, ম্যানেজার নন। বসুন—একসঙ্গে বসুন।" অনেক দ্বিধায় তাফু মিঞা ফরাসের এক কোণে বসল। "এবার বলুন, কী আপনার খবর!" তাফু মিঞা মথুরের দিকে একবার তাকাল, সে দৃষ্টির অর্থ জমিদার বুঝতে পারলেন।

"মথুর, তুই বাইরে যা। দেখিস কেউ যেন সামনের বারান্দায় না ওঠে।" মথুর বেরিয়ে যাবার পরও ম্যানেজার ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন।

"বাবু, ইমতু আবার আপনার পিছনে লেগেছে, সে চেষ্টায় আছে চন্দরের বৌ-এর ঘটনাটাকে আবার খুঁড়ে বের করবার। আমি জানতে পেরেছি যে, সে একটা বেশ ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, চেষ্টায় আছে চন্দরকে আর নিশেপতিকে উস্কিয়ে দেবার। জেলার পুলিস সাহেব বদলেছে, ওরা নাকি তার কানে কথাগুলো আবার তুলতে চায়।"

তাফু মিঞার কথাগুলো যাদব চক্রবর্ত্তীর রক্তে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। অন্য সময় হলে তিনি অগ্ন্যুদগার করতেন কিন্তু তখন তিনি বুদ্ধির অন্য চাল চাললেন।

"কিন্তু—চন্দরের বৌ-এর ব্যাপারে আমার তো কোন হাত নেই কাকাবাবু—"

"সে কী আর আমি জানিনে হুজুর! তবে একটা ঘোট পাকিয়ে তুলতে কতক্ষণ? কিছু হোক না হোক, একটা হুমদাম হ'লও তো অপমান।"

"সে জিনিস কবে কবর চাপা পড়েছে—সরকারের ঘরে কাগজ হ'য়ে গেছে—"

"তাও জানি। ইমতুকে নাকি কে বুদ্ধি দিয়েছে যে সে সব কাগজ আবার তাজা হতে পারে—কবর খুঁড়ে আবার মামলা ওঠানও নাকি আইনে আছে। রামসিং বড় বেশী যাতায়াত করছে ইমতুর বাড়ীতে। তুটোয় তো আদায় কাচকলায় ছিল আগে!"

"রামসিং!—হুঁ—!" জমিদার চীৎকার করে উঠে যেন নিভে গেলেন এক ফুৎকারে। মনে পড়ে গেল তাঁর কিছু পূর্ব্বের মথুরের সতর্ক বাণী। জমিদার বহুক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ

করে কি বিষয়ে যেন একটা স্থিরনিশ্চয় হয়ে যা[illegible] রাত্রি প্রায় পরামর্শ, গোপনতর তার নিহিত অর্থ, গোপনতম তার সুদূর [illegible] ছায়া। ম্যানেজার চলে যাবার পর যাদব চক্রবর্ত্তী মথুরকে ভিতরে ডেকে তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। প্রভু-ভৃত্যে এই প্রথম পরামর্শ।

"মথুর, পারবি তো? এতদিন তোকে ভাই-এর মত ভালবেসেছি—না যদি পারিস, তবে চেয়ে দেখ চারিদিকে—এই বাড়ী, এই আয়োজন,—এই সাজান সংসার সব এক ফুঁয়ে নিভে যাবে। আমার জন্য দুঃখ হয় না রে, আমার নিজের কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হয় আমার রক্তধারার জন্য, সেটা হয়তো একেবারে মুছে যাবে। তোর রাজাবাবু—সে হয়তো পথের ভিক্ষুক হয়ে যাবে রে মথুর! যদি না পারিস. তবে একসঙ্গে আমাকে, তোর রাজাবাবুকে—"

মথুর পাগলের মত কেঁদে উঠে তার প্রভুর পা জড়িয়ে ধরে বলল,—

"—আর ভাববেন না বাবু, আমার রাজাবাবুকে বাঁচাতেই হবে। তার জন্যে আমি সব করতে পারি বাবু।"

"আঃ—" যাদব চক্রবর্ত্তী জলহীন একপাত্র সুরা মুখে ঢেলে দিলেন। তীব্র জ্বালা তাঁর কাছে যেন অমৃত বলে মনে হল—সমস্ত অন্তরটা তঁ[illegible] শীতল হয়ে গেল।

পরদিন জমিদার অকস্মাৎ মহকুমায় চলে গেলেন। নিত্য-সঙ্গী মথুর সঙ্গে গেল না, শরীর-রক্ষক রামসিংও সঙ্গে গেল না—সঙ্গে গেল অন্য ভৃত্য, অন্য সিপাহী। মহকুমায় যাওয়ার জন্য দপ্তরে বা গ্রামেও কোন চাঞ্চল্য আসে নাই। দু-একটি প্রাণী ছাড়া এটিকে কেউ বিশেষ লক্ষ্যও করে নি। মহকুমায় পৌঁছে জমিদার মহকুমা হাকিমের সহিত সাক্ষাতের আবেদন জানালেন। মহকুমা-প্রভুর আদেশে সন্ধ্যার পর দু'জনের সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত হল। হাকিম দেশী সুতরাং তাঁর কায়দা-কানুন বিলাতি সাহেবকেও হার মানিয়ে দেয়।

“মথুর, ত[illegible] জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তী হাকিমের সঙ্গে দেখা করে না[illegible] জমিদারোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। নিজের ও বাড়ীর পক্ষ থেকে যথোচিত ডালিও প্রদান করলেন এবং ডালির সঙ্গে জমিদার হাকিমের ফ্রক-পরা, বব্ করে চুল ছাঁটা তের চৌদ্দ বছরের মেয়ের হাতে একখানি একশ টাকার নোট দিয়ে বিনীত ভাবে হাকিমকে বললেন—

“হুজুর! মিসিবাবার জন্যে এই সামান্য কিছু মিষ্টি খেতে দিলাম। হুজুরের বাড়ীর উপযুক্ত মিষ্টি এখানে পাওয়া যায় না। আর এসব হুজুরের জন্যও নয়, এ আমার মা'র জন্যে। বাবা বলতেন, ছেলেদের বাড়ীতে খালি হাতে যেতে নেই—”

“এ-সবের কী দরকার ছিল মিঃ চক্রবর্ত্তী! আপনি কেন এত কষ্ট করলেন—কী দরকার ছিল?” হাকিম ডালিটিকে ভিতরে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে জমিদারকে মৃত প্রতিবাদ জানালেন। বিলাতি হাকিমরা সে যুগে বড়দিনের ডালি নিতেন, তার জন্য তারা ডালে ডালে বেড়াতেন না। দেশী হাকিমরা কিন্তু তার জন্য পাতায় পাতায় বেড়াতেন। তাঁদের মুখোস ছিল ইংরাজের, কিন্তু মন ছিল মলিন। ডালির পর হাকিমের কড়াভাব কিছু নরম হল। তিনি সহাস্যে জমিদারের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জমিদার হাকিমকে নিজের গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানালেন, জানালেন তাঁর সদিচ্ছা এবং নিজের জন্মভূমির সেবার। এমন কি তার জন্য তিনি নিজের যথাসাধ্য স্বার্থ-ত্যাগ করতেও প্রস্তুত আছেন। জমিদার নিজের ইচ্ছা জানালেন যে, গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালাটিকে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত ক'রে হুজুরের নামে সেটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার। সেজন্য তিনি তাঁর অনুমতি চাইলেন এবং একদিন তাঁর পদধূলি প্রার্থনা করলেন। অতি বিনীতভাবে হাকিম তাঁর স্বীকৃতি জানালেন। বিনয়ের সঙ্গে

শেষে অনুরোধ ও মিনতি জানিয়ে যাদব চক্রবর্ত্তী রাত্রি প্রায় দশটার সময় হাকিমের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

যাদব চক্রবর্ত্তী যখন মহকুমা হাকিমের কাছে নিজের গ্রামের সেবার জন্য, উন্নতির জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছিলেন, তখন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর গ্রামে দুটি ঘটনা আলোড়ন তুলল। জমিদারের সিপাহীমহলে রামসিং হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। লোকের দৌড়াদৌড়ি ও ডাক্তারের আপ্রাণ চেষ্টাতেও রামসিং-এর জ্ঞান ফিরে এল না। কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগের পর রামসিং সুদূর বিদেশে আত্মীয় স্বজন থেকে বহুদূরে অজ্ঞানে প্রাণ-ত্যাগ করল। অতিরিক্ত সিদ্ধি পানের ফলেই মৃত্যু হয়েছে—ডাক্তার এই মতামত প্রকাশ করলেন। রামসিং-এর নাতি ক্ষুদ্র সিদ্ধির লোটাটি তখনও তার স্থির তুহিনশীতল পায়ের কাছে সর্ব্ব সম্মুখে অতিরিক্ত সিদ্ধি পানের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জমিদারের প্রিয়তম সিপাহী সে, তাঁর আগমনের অপেক্ষায় রামসিং-এর মৃতদেহ সযত্নে রক্ষিত হ'ল। রামসিং যাবার সময় জমিদারের জীবন-কাঠি ও মরণ কাঠিটিও গোপনে সঙ্গে নিয়ে গেল। সে যে-দেশের লোক, সে-দেশের লোক প্রাণ নিতেও জানে, প্রাণ দিতেও জানে। নুনের গুণ তারা শেষ পর্য্যন্ত গেয়ে যায়। রামসিংও শেষ পর্য্যন্ত মালিকের মৃত্যু-বাণ নিজের বুকের মধ্যে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

রামসিং-এর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে গ্রামে একটা তুমুল আলোড়ন উঠল। ইমদুর মৃতদেহ ময়নামতীর চরে পড়ে আছে। লোক ভেঙ্গে পড়ল ময়নামতীর চরে। ইমদুর মৃতদেহ ময়নামতীর চরে ঠিক সেই স্থানে পড়েছিল—যেখানে একদিন শশাঙ্কের মৃতদেহ এই ভাবেই পাওয়া গিয়েছিল। বর্ষার প্রারম্ভে ময়নামতীর চর অধিকাংশ আত্মগোপন করেছে নদীর জলে, যে অংশটুকু একদিন শশাঙ্ককে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই অংশ আজও জেগে আছে ইমদুকে

আশ্রয় দেবার জন্য। মেঘের ছাওয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইমতু যেন এক চোখে জমিদারকে অভিবাদন জানাচ্ছে, এবং অন্য চোখে নীলমাধবকে আশীর্ব্বাদ করছে।

পরদিন সকালে জমিদার গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে সংবাদ শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন যাদব চক্রবর্ত্তী। তিনি নিজে চলে গেলেন ইমতুর বাড়ীতে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সান্ত্বনা দিলেন তার স্ত্রী-পুত্রকে, ব্যবস্থা করলেন তার কফনের। জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তী যখন ইমতুর ডাক্তার-পরীক্ষিত শবদেহকে সর্ব্বংসহা মাটির কোলে শুইয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহরকে অতিক্রম করে পশ্চিমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি চলে গেলেন রামসিং-এর শবদেহ সংকারে। গ্রামের শেষ প্রান্তের মহাশ্মশানে বহুদিনের প্রিয় রামসিং-এর নশ্বর দেহ যখন অগ্নির শেষ লেলিহান জিহ্বায় নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন জমিদার নদীর ধারে কাদার উপর বসে তাকিয়ে ছিলেন ওপারের দিকে। বড় প্রিয় ছিল রামসিং তাঁর। নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে সে জমিদারকে আমরণ রক্ষা করে এসেছে। জমিদারের ও জমিদারির সম্মান বাঁচান তার যেন একটি নেশা ছিল। ওপারে মেঘ—কালো মেঘ ছেয়ে এসেছে, যারা পার হবার পার হ'য়ে গেল, যাদব চক্রবর্ত্তী যেন একা, নিঃসঙ্গ এ-পারে 'পড়ে রইলেন। ভীত ত্রস্ত জমিদার উঠে এলেন চিতার কাছে, তখন রামসিং-এর চিতায় জল ঢালা হচ্ছিল! মুষলধারায় এল বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি মাথায় করে জমিদার যখন বাড়ী ফিরলেন, তখন রাত্রি ঘিরে ফেলেছে সমস্ত গ্রামটিকে। সমস্ত গ্রামখানা থম্‌থমে ভাব, পেট-কাটা কুঠুরীর মাথার আলোটি বৃষ্টি-ধারায় স্বপ্নাচ্ছন্ন!

নিজের ঘরে আরাম কেদারায় দেহকে এলায়িত করে দিলেন যাদব চক্রবর্ত্তী। ডাকলেন—"মথুর!" ফরাস বেছা!" তাঁর

কণ্ঠস্বর আজ বড় বিষণ্ণ! সমস্ত রাত্রি বসে তিনি সুরা পান করলেন—নিজেকে, নিজের পৃথিবীকে ও পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়াকে ভুলবার জন্য। আজ তিনি যেন বড়ই নিঃসঙ্গ, বড়ই একা। এই অবস্থায় সঙ্গ দেবার মত একজন লোকও তাঁর আজ নাই। সাথী করেন এমন একটি লোকের কথাও মনে পড়ল না তাঁর। শুধু মনে পড়তে লাগল শশাঙ্কর কথা, লতার মুখচ্ছবি, বড় বৌ-এর কাতর দৃষ্টি, রামসিং-এর মাংসবহুল তৈল-চিক্কণ দেহটি এবং ইমতুর প্রজ্জ্বলিত মুখখানি। একে একে যখনই তাদের কথা মনে পড়ে, জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তী একপাত্র সুরা দিয়ে নিজের অন্তরের জ্বালাকে দমন করতে চেষ্টা করেন। সমস্ত রাত্রি বাহিরে মুষলধারায় বৃষ্টি হল। শান্ত হ'ল গ্রামের আবহাওয়া, স্তব্ধতর হল গ্রামের স্থিতি। কিন্তু জমিদারের অন্তরের জ্বালা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হ'ল না। মথুর ভিতরের দরজার পিছনে বসে থাকল সমস্ত রাত। ঝিমুতে ঝিমুতে তার কখনো কখনো মনে পড়ে যায় রামসিং-এর কথা, কল্পনা করে ফেলে নিজের ভবিষ্যৎ। এক একবার যেন নিজের ভবিষ্যৎ দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

অন্ধকার কেটে গেল আকাশের বুকে। দুধের মত সাদা একটা পাতলা পর্দ্দা ছড়িয়ে পড়ল নদীর বুকে, ঝাউগাছের মাথায়। ঝাউগাছের মাথাটা হঠাৎ পাখীর কাকলিতে জাগরিত হয়ে উঠল। জমিদার-প্রাঙ্গণে ছাতারে পাখীগুলো লেজ তুলে লাফালাফি করে বেড়াতে লাগল। মথুর তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখে, যাদব চক্রবর্ত্তী বোতল ও গেলাসের মধ্যে ফরাসের উপর শুয়ে আছেন অচেতন অবস্থায়। মথুর তাঁকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ফরাসটি পরিষ্কার করে ফেলল। সকলের ভোর হ'য়ে এল, জমিদারের যেন সবে হল রাত্রি।

ইমতুর মৃত্যুর পর তার সংসারটা যেন এলোমেলো হয়ে পড়ল। ইমতু তার পশ্চাতে রেখে গেছে বেশ কিছু খামার জমি, একটি বড় খড়ের বাড়ী, বাড়ী-সংলগ্ন একটি ফলের বাগান, এবং বাড়ীতে তার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র সাহজাদা, একটি মেয়ে জাহানারা, কয়েকটী গরু-বাছুর ও মুরগী। সম্পত্তির অংশ পাবার জন্য পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী, সম্পত্তি রক্ষার জন্য কেউ-না। সাহজাদা স্কুলে পড়ে নীলমাধবদের সঙ্গে। ইমতুর ইচ্ছা ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাষা থেকে বাবুর পর্য্যায়ে উন্নত করবার। জাহানারা ইমতুর শেষ সন্তান। দশ বৎসরের সুন্দরী মেয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে বন্যার জন্য অপেক্ষা করছে ও স্রোতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইমতু বেঁচে থাকতেই নীলমাধব সাহজাদার বাড়ীতে যাতায়াত করত,—যাতায়াত করত বিদ্যালয়ের সম-শ্রেণীত্বের আকর্ষণে। সেখানে শ্রেণী আছে কিন্তু শ্রেণীভেদ নাই, ভাগ আছে কিন্তু বিভাগ নাই। গ্রামের জমিদার তাঁর স্বাতন্ত্র্য রাখেন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য, কিন্তু জমিদারের পুত্র সে দূরত্ব বজায় রাখে না, রাখতে শিক্ষাও দেওয়া হয় না। সেই পুত্রই যখন বড় হয়, তখন সে অনায়াসে খোলস ছেড়ে কেউটে হয়। সহরের আভিজাত্য প্রথম সোপান থেকে আরম্ভ হয় বলে শেষ সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছতে পারে না। গ্রামের আভিজাত্য সহজ-জাত বলে সহজেই সেটা দানা বেঁধে ওঠে। গ্রামের স্কুলে নীলমাধব, সাহজাদা ও তাফু মিঞার শেষ পুত্র মাহ্‌মুদ অন্তরঙ্গ বন্ধু। জাতির ও সঙ্গতির জীর্ণ বেড়াকে অতিক্রম করে তারা অবারিত এক সবুজ মাঠে পদার্পণ করেছে—যেখানে আছে শুধু সহজ ভাব ও বাধাহীন গতি।

ইমতুর মৃত্যুতে সমস্ত গ্রাম ও আশপাশের দু-একখানা গ্রাম, এমন কি ইমতুর স্ত্রীও জমিদারকে সন্দেহ করলেও সে সন্দেহ, সে অনুমান নিজের কণ্ঠের নীচেই রাখতে হয়েছে। চিন্তাকে ভাষা দেওয়া

দূরে থাক, চোখের তারায়ও সে চিন্তা ফুটিয়ে তুলতে সে ক্যান?
পায় নি। ইমদুর স্ত্রীও সে জ্বালায় নিজেকে তিলে তিলে জ্বা-
থাকল একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে। রাত্রে মাঝে মাঝে
ভয়ে সে সাহজাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরত তাকে যেন রক্ষা করবার
জন্য। ইমদুর মৃত্যুর পর নীলু কিছুদিন প্রত্যহ সাহজাদার
বাড়ীতে যেত। সে যেত সান্ত্বনা দেবার জন্য নয়, সান্ত্বনা দেবার শক্তি
তার তখনও আসেনি, সে যেত সাহজাদার শুষ্ক মুখটি মনে করে।
নীলমাধবকে জড়িয়ে ধরে কতদিন সাহজাদা একান্তে বসে কেঁদেছে।
তাকে সান্ত্বনা দেবার পরিবর্ত্তে নীলুর দু'চোখ বয়ে গড়িয়ে পড়ত
অশ্রুধারা। সুখে নয়—চোখের জলেই দুই জাতি এক হয় জাতিভেদ
ভুলে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইমদুর স্ত্রী যেন নীলমাধবকে আরো
কাছে টেনে নিল। মায়ের বুক সন্তানকে কাছেই টানে। মায়ের
বুকে দুধ দু'টি কিন্তু তার ধারা অনেক, সব কয়টি ধারা দিয়েই দুধ
বাহির হয়।

ছুটির দিনের একটি সকালে নীলমাধব এসে উপস্থিত হল বন্ধুর
বাড়ীতে। রাত্রির বর্ষায় সদ্যস্নাত গ্রামটি। গাছে গাছে নতুন
জীবনের সাড়া। সবুজের নিমন্ত্রণ। আকাশে স্তরে স্তরে খণ্ড খণ্ড মেঘ
এলোমেলো বাতাসে চলাচল করছে—ঢলাঢলি করছে গায়ে গায়ে।
পথের সংকীর্ণতা বেড়েছে দু'পাশের বন্য-ঝোপ-ঝাড়ে, গভীরতা
বেড়েছে পঙ্কিলতার জন্য। আঁঠেলের গাছগুলো আবার প্রাণ
পেয়ে পথ-চলা পথিককে মাথা নত করে প্রণিপাত জানাচ্ছে। তার
একটা তিক্ত-মিষ্ট গন্ধ সমস্ত বাতাসকে আমোদিত করে ফেলেছে।
বন্য ফুল ও গ্রাম্য ফুলগুলি পথের দু'পাশে ফুটে আছে নিজের
যৌবনে অবহেলিতভাবে। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন গন্ধের একটা বিচিত্র
সমাবেশ। ছোট ছোট গাছের মাথায় দোয়েল শিষ দিয়ে চলেছে
নিজের মনে। শালিকের কিচির মিচির, ছাতারে পাখীর চঞ্চলতার

ইমদুর্, পথের দু'ধারে গর্ত্তে বৃষ্টির জলে ভেকের কর্কশ ডাক—ইমদু-কসঙ্গে মিলে নিরালা পথটিকে দিনের আলোতেই যেন নিঃসঙ্গ করে ফেলেছে। জমিদার বাড়ীর সীমা পার হয়ে নীলু ধরল উত্তরের পথ। বামুন পাড়া পার হলেই খানিকটা চষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আলের পথ। পথের দু'ধারে জলা জমিতে আউস ধানের লুটোপুটি। তার মাথায় মাথায় বাতাসের ঢেউ, পূর্ণতার নম্রতা। মাথা থেকে কটিদেশ পর্য্যন্ত কর্দ্দমাক্ত করে চাষারা মনের আনন্দে কাজ করে চলেছে। থেকে থেকে কিসের যেন একটা সর্ সর্ শব্দ পাচ্ছিল নীলমাধব ধানের ক্ষেতে—বোধ হয় গুইসাপ। গুইসাপ কামড়ায় না, লোকে বলে ওরা সাপের শত্রু। নীলু শব্দ শুনেই চোখ বন্ধ করে নিচ্ছিল—চোখ বন্ধ করে নিলে ওদেরও নাকি চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কী জানি সত্যি কিনা। খানিকটা মাঠ পার হয়ে সে পড়ল মিঞাটোলায়। মিঞাটোলার মুখের কাছেই, কাদিরের বাড়ী, হামিদের বাঁশঝাড়, নাসিরের বাড়ী ও বেতঝোপের পরই ইমদুর বাড়ী। নাসিরের বেতঝোপের কাছে আসতেই নীলু একটা বিশ্রী শব্দ শুনল। কোঁ—কোঁ—! সাপে ব্যাং ধরেছে। নীলু চোখ বন্ধ করে এক দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হল সাহজাদার বাড়ী। ভিতরের পোতায় বসে সাহজাদা শশা দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল। তার মা রৌদ্রের আশায় এক ধামা কাঁঠালের বীচি একটা চাটাইএর ওপর বিছিয়ে দিচ্ছিল। নীলু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ইমদুর স্ত্রীকে।

"কী হলো রাজাবাবু—কী হলো?" ইমদুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল নীলমাধবকে।

"চাচী—সাপ্—!"

"সাপ। কনে সাপ? কী সাপ?" তার প্রশ্নের পর প্রশ্নে ভীতিটুকু নীলুর দশগুণ আকার ধারণ করল। "তুমারে আমি

কতদিন কইছি রাজাবাবু—তুমি ঐ ক্ষ্যাত ভাঙ্গে আস ক্যান? কায়েত পাড়াডা ঘুরে আসলিই পার!”

“সে যে অনেক ঘুর হয় চাচী!—”

“অনেক কনে? বড় জোর দশ লগা হবি! তাহোক—পরানডার কাছে ত দশ বার লগা কিছু না। বস, তুমি দাওয়ার ওপর বস থির হয়ে একটু। ওঃ, আমার বুকডার মধ্যি এখনো ধরাস্ ধরাস্ করতিছে।” ইমতুর স্ত্রী নীলমাধবকে ধরে এনে বসিয়ে দিল সাহজাদার পাশে। নীলু এতক্ষণে লক্ষ্য করল সাহজাদাকে, সে মুড়ির গ্রাসের ফাঁকে ফাঁকে হাসছিল।

“তুই হাসছিস যে?”—নীলুর প্রথম প্রশ্ন।

“এ যে হাসিরই কথা নীলু। আসছে বছর ম্যাট্রিক দিবি—তোর সাপের ভয় দেখলে তোকে পরীক্ষাই দিতে দেবে না।”

“সাপের সঙ্গে পরীক্ষার কী সম্পর্ক?”

“সম্পর্ক এই যে, তুই এখনো বাচ্চা—এত বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে দেওয়া ঠিক নয়।”

“তুই থাম দিকি সাহা। বাচ্চা আমার ভয়ে নীল হ'য়ে গেছে—তুই কস্ ঠাট্টার কথা। রাজাবাবু, আমার মাথা খাও, তুমি আর ক্ষ্যাত হ'য়ে আসতি পারবা না।”

“আচ্ছা চাচী, তোমার মাথা পরে খাব। এখন আমায় মুড়ি দাও।” ইমতুর স্ত্রী একটি ছোট কাঠায় করে মুড়ি ও একটা আস্ত শশা এনে দিল। নীলমাধব বামুনের ছেলে, তাকে সে নিজেদের পাত্রে খেতে দিত না, কোন কাটা ফলও দিত না।

“সাহা, স'রে বস—আমাকে ছুঁসনে যেন।”

“কেন—?”

“তুই মিঞা। তোর ছোঁয়া খেলে জাত যাবে।” উত্তরে সাহজাদা শুধু মা'র দিকে তাকাল।

"মা কী জাত ?"

"মা-চাচীর জাত হয় না। চাচী, একটা মরিচ।" নীলু ততক্ষণে মুড়িতে মন দিয়েছে। দু'জনে মুড়ি চিবুতে চিবুতে আঙ্গিনার বাইরে চলে এল। সীমাবদ্ধ স্থান ও আবহাওয়া কোন দিনই নীলমাধবের ভাল লাগে না। চর্ব্বণের চাপে চাপে চাপা চাপা কথা বলতে বলতে দু'জনে এগিয়ে চলল নদীর দিকে। নীলুর হাতে মুড়ির কাঠা, সাহজাদার হাতে মুড়ির বাটি।

"কাঠা হাতে করে কতদূর যাবি ? কেউ দেখে ফেলবে!—" সাহজাদা প্রতিবাদ করল। বিস্মিত হল নীলমাধব।

"দেখলে তো কী হয়েছে ? চুরি করছি নাকি ?"

"লোকে বলবে কী, বাবুর ছেলে হয়ে— !"

বাবুর ছেলে সোনার কাঠায় সোনার মুড়ি খায় না—চল!

সর্পিল গতিতে যে পায়ে-চলা পথটি নদীর বুকে গিয়ে মিশে গিয়েছে, তারই বুকে নীলু ও সাহজাদার একত্র পদক্ষেপ! দু'ধারে বর্ষার জলে গ্রামের নিজস্ব জংলি গাছগুলো মাথা তুলেছে। মাঝে মাঝে আঁঠেল বৈঁচির মিশ্রিত তিক্ত-মিষ্ট গন্ধ। ডানদিকে বেতের ঝোপে একটি লতা উঠে তাকে চতুর্দ্দিকে জড়িয়ে ধরেছে। লতার স্তরে স্তরে ফুল, থোকায় থোকায় ফল। ফিকে হল্‌দে ফুলগুলো বেতের পুষ্ট দেহে লুটিয়ে পড়ছে হাওয়ায়। বেতের কাঁটায় ছ'ড়ে যাচ্ছে তাদের পাপড়ি, তাতেই যেন তাদের আনন্দ। সেই ক্ষতই যেন তাদের যৌবনকে সার্থক করে তুলে এবং এনে দেয় জীবনে তাদের পূর্ণতা!

"নীলু, দাঁড়া, কিছু বেতাগা ভেঙ্গে আনি, মাকে দেব তরকারি রাঁধতে! বেতের কচিকচি অগ্রভাগকে গ্রামে বেতাগা বলে। বেতাগার স্যুক্তো গ্রামে একটি লোভনীয় আহার্য্য।

"কক্ষনো না। বেতবনে এখন সাপ থাকে—ঐ শোন কি যেন

একটা সর্‌সর্‌ করছে।" দু'জনে দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হল নদীর ধারে। নদীর ধারে কাঁচা ঘাটে কাদার ওপরে জলের বুকে পা দিয়ে বসেছিল জাহানারা। তার পা এবং তার খড়কে ডুরে শাড়ীর নীচের অংশ ভিজে গেছে জলে। জাহানারা তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে ছিপের ফাৎনার দিকে। ছিপের মাথায় ফাৎনাটা জলের স্রোতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ভাসমান স্যাওলা এসে জড়িয়ে যাচ্ছে তার গায়ে ক্ষণিকের জন্য। ভরা যৌবনের স্রোতে এমন দু-একটি খড়কুটা গায়ে লাগে সত্য, কিন্তু বেশীদিন বা বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না। অস্বচ্ছ ভরা নদীর বুকে জাহানারা নিজের আগত-প্রায় যৌবনের ইঙ্গিত খুঁজে মরছিল।

জাহানারাকে সেখানে দেখে নীলু অবাক হয়ে গেল। সে চুপি চুপি গিয়ে পিছন থেকে একটানে তুলে নিল ছিপটাকে। ছিপের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল দু-একটি স্যাওলা মাত্র। জাহানারা চীৎকার করে উঠল,—রোষ-কাতর কণ্ঠে অনর্গল কী যেন বলে গেল নীলুদাকে। তার অর্থ না বুঝলো সে নিজে, না বুঝল তার নীলুদা। উত্তরে নীলু হাসতে লাগল—"উঃ, দেখলি কত বড় রুই মাছটা পালিয়ে গেল—দেখলি সাহা।" নীলুর উপহাস জাহানারাকে আরো যেন ক্ষিপ্ত করে দিল। সে নীলুর পিঠের উপর পাগলের মত কিল চড় বর্ষণ করে ছুটে পালিয়ে গেল বাড়ীর দিকে। পিছনে থেকে গেল তার ছিপ, থেকে গেল তার ছিপের ফলের আশা, থেকে গেল ভরা নদী! বাড়ী ফিরে গিয়ে জাহানারা মা'র কাছে নীলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে উত্তরে সহানুভূতি পেল না, পেল শুধু ভৎ‍র্সনা।

"ঠিক করিছে নীলু। মারতি পারলনা তোরে, মারাই ঠিক ছিল তোকে। এত বড় ছ্যাম্‌রি ঘাটে গিয়্যা মাছ ধরতেছিলি?" মার

উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেল জাহানারা, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নীলুদার ওপর! নীলু যখন সাহজাদার সঙ্গে তাদের বাড়ী ফিরে এলো, তখন জাহানারাকে আর দেখতে পেল না আঙ্গিনায়, শুধু জানতে পারল তার অভিযোগের কথা।

"কোথায় সে চাচী? ওকে মারাই উচিত ছিল। তুমি ওকে ঘাটে যেতে দাও কেন? যদি ডুবে মরে!" ঐ কথার উত্তরে ইমতুর স্ত্রী জানাল যে, অমন ডানপিটে মেয়ে ডুবে মরলেও তার দুঃখ নাই, তার হাড় নাকি ভাজা ভাজা হ'য়ে গেছে তার জন্যে। ঘরের এক কোণে নীলু জাহানারাকে আবিষ্কার করল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের কোণে জাহানারা—ডানপিটে মেয়ে জাহানারা আত্মগোপন করেছিল নীলুর কাছে ধরা না দেবার জন্য। নীলু যখন তাকে গিয়ে ধরল, তখন সে আঘাতপ্রাপ্তা সর্পিণীর মত নীলুকে কিল চড় মেরে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল। নারীর ক্রোধ ঝর্ণার মত। সে সবেগে—সফেন গর্জ্জনে আসে উঁচু থেকে সত্য কিন্তু মুহূর্ত্তে নীচে পড়ে নিজেকে চূর্ণ করে বহে যায় ক্ষীণকায়া নদী হয়ে। সে উপর থেকে আসে, কিন্তু ধরা দেয় পায়ের কাছে। নীলু যখন জাহানারাকে ধরে নিয়ে আঙ্গিনায় এল, তখন নীলুর জামার অর্দ্ধেক অপর অর্দ্ধেককে পরিত্যাগ করেছে। নীলু তখন হাসছে। জাহানারা তখন শান্ত হয়ে এসেছে—আঙ্গিনায় এসে সে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার ভাইজানকে। সে জানে যে সাহজাদাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত মা'র মারের হাত থেকে রক্ষা করবে।

"এঃ—তুই নীলুর জামাটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছিস রে—!"

"দিয়ে দেব ওর জামা। নতুন জামা দিয়ে দেব কিনে।" জাহানারার এ কথার উত্তরে তার কুপিতা মাও হেসে ফেলল। জমিদারের একমাত্র পুত্রকে নতুন জামা কিনে দেবে ইমতুর কন্যা! হাসির কথা বই কি! বাড়ী ফিরল নীলু সাহজাদাকে সঙ্গে করে।

ইমন্থুর স্ত্রীর অনুরোধে এবার সে বিশেষভাবে তার পথকে পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হল। তারা দু'জনে ধরল কায়েৎপাড়ার পথ। কায়েৎ-পাড়ায় ঢুকতেই খালের ওপর একটা বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর কিছু দূরেই নীলু থমকে দাঁড়াল, টেনে ধরল সাহজাদার হাত।

"কি, দাঁড়ালি যে—!" সাহজাদা অবাক হয়ে যায়।

"দাঁড়া,—আগে দেখ কোন বাঁশ শুয়ে আছে কি না! এটা সেই বাঁশ-ঝাড় রে—!"

"দূর—তুই না বেরাহ্মণ—রাম রাম, চল কিছু হবে না। আমি তো যখনই এই পথে যাই, এখানটায় এসে রাম রাম বলি, বাঁশ কোনদিন আমার পথ আটকায় নি!" সাহজাদা নিজে রাম রাম বলতে বলতে সাঁকো পার হয়ে গেল। এই সাঁকোর অর্থাৎ বাঁশের সেতুর মুখেই একটি ঘন বাঁশ ঝাড় আছে, জায়গাটি বড় নির্জ্জন, বড় মধুর। লোকে বলে কখন কখন সেই বাঁশ ঝাড় থেকে একটি বাঁশ পথের উপর পড়ে থাকে—আড়াআড়ি ভাবে। কোন লোক যদি সেটাকে ডিঙ্গিয়ে পার হতে যায় তবে বাঁশটি সেই লোকটিকে সোজা তুলে দেয় আকাশে। সে স্থানটির ভীতি দু'চারখানা গ্রামে ছড়িয়ে আছে বহুদিন থেকে। স্মরণীয় সময়ের মধ্যে অবশ্য কেউই সেই বাঁশে চড়ে আকাশে যায় নি। কিন্তু মুখে মুখে তার গল্প একেবারে জীবন্ত হয়ে আছে। ছেলে শুনেছে তার মা'র মুখে, মা শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। জীবন্ত কাহিনী শুনিয়ে চলেছে। ছোটরা সে পথটিকে সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, বড়রা সে পথে এলে সাঁকোর মুখের কাছে এসে মনে মনে রাম রাম নাম করে। বাড়ীর কাছে এসে নীলু চলে গেল বাড়ীর ভিতরে, সাহজাদা অদূর থেকেই ফিরে গেল তার নিজের বাড়ী।

পিতাকে বাহিরের বারান্দায় দেখে নীলমাধব পিছনের

খিড়কি দরজা দিয়ে আঙ্গিনায় আত্মগোপন করল। প্রথমেই সাক্ষাৎ তার ছোট মা'র সঙ্গে।

"হ্যাঁ রে নীলু, এ কি দশা তোর! জামার এ দশা কে করল! দিদি—দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড! এ তো একেবারে ডানপিটে ছেলে রে বাবা—!" ছোট রাণীর কথা শুনে বড়রাণী ছুটে এলেন সেখানে। পরণে গরদের কাপড়। দেখে অনুমান করা গেল তিনি পূজার প্রস্তুতিতে ছিলেন। বড়-মাকে দেখে নীলু দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। লুকিয়ে দিল তাঁর বুকে মুখটি।

"যা! সব গেল।"—চীৎকার করে উঠলেন ছোট রাণী। "ছুঁয়ে দিলি দিদিকে—উনি না পূজোয় যাচ্ছিলেন!"

তা দিক ছোট বউ। ছেলে ছুঁলে জাত যায় না। গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেব। "আয় নীলু তোর জামাটা বদলে দি। একটা জামা ছিঁড়ে এসেছিস—আমি ভাবলাম না জানি কী হ'ল।" দিদির কথা শুনে ছোট রাণী মৃদু হেসে তাঁর মহলের দিকে চলে গেলেন, মুখের পানে তাঁর আর একটু জরদা লাগবে।

বর্ষণমুখর সায়াহ্ন। নবগঙ্গায় বান ডেকেছে। তুকূল ছাপিয়ে তার জল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে খড়কুটা, ডালপালা, কচুরি পানার চাপ। ভেসে চলেছে সব একই দিকে, একই বেগে। স্রোতের আবর্ত্তে পড়ে মাঝে মাঝে তারা নদীর বুকে এক একবার ঘুর পাক খাচ্ছে। নবগঙ্গার তু-কূল ভরা জল টল টল করছে, ছল ছল করছে। বাবুর ঘাটের পাকা সিঁড়িগুলির মাত্র আর তুটি ধাপ আছে জেগে, এই তুটি জলের তলায় গেলে গ্রামের অধিকাংশ জলের তলায় চলে যাবে। জমিদারের অধিকাংশ মহল থেকেই এসেছে বন্যার খবর, এসেছে প্রজাদের অসহনীয় তুঃখের যোগসূত্রহীন সংবাদ। সম্মুখের বারান্দায় জমিদার নদীর ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। নদীর জল পেট-কাটা কুঠুরীর কাছে চলে

এসেছে দপ্তরে বন্যার সংবাদ দিতে। পেট-কাটা কুঠরীর মাথার উপর আলোটি যথারীতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সিপাহী মহলে সামান্য তৎপরতা দেখা যাচ্ছে,—তারা বোধ হয় রাত্রির ভোজনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। বাবুর ঘরে আলো দেওয়া হল, প্রধান দপ্তরে জ্বালিয়ে দেওয়া হল সাঁঝের বাতি। দপ্তরের অদূরে ঝিঙ্গের মাচানে ঝিঙ্গের ফুলগুলো অজস্র ফুটে উঠেছে। বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে বেজে উঠল শঙ্খ, ঠাকুর ঘরে বেজে উঠল সন্ধ্যারতির ঘণ্টা। ঝাউ গাছের মাথাটা বর্ষার জলে ও সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে এল যাদব চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টির সম্মুখে। যাদব চক্রবর্ত্তীর গড়গড়ায় কলকে পালটিয়ে দিয়ে গেল মথুর। বাবু নলটি টেনেই চলেছেন, ধোঁয়ার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। নতুন কলকে হাতে করে এসে মথুর দেখল, বাবু শুধু গড়গড়ার নলটিই টেনে চলেছেন, পায়ের তলার চটি জুতা, কোঁচার বিলম্বিত অংশ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। মথুর নিঃশব্দে কলকেটি গড়গড়ার মাথার উপর বসিয়ে দিল। কোঁচাটি তুলে দিল আরাম কেদারার উপরে।

"বাবু!"—মথুরের ডাকের উত্তরে জমিদার শুধু একবার তার দিকে তাকালেন। "ঘরে ফরাশ বিছিয়ে দেব বাবু?"

"কেন রে?"

"আপনার কাপড়, জুতো সব ভিজে গেছে যে বাবু!"

"আচ্ছা দে—!"

মথুর তাঁর ঘরে ফরাস বিছিয়ে দিলে জমিদার তাঁর ঘরে চলে এলেন। ফরাসে বসে সুরার পাত্র হাতে নিলেন যাদব চক্রবর্ত্তী। দু' একবার চুমুক দিলেন সে পাত্রে, কিন্তু কেন জানি না এত প্রিয় সুরাও তাঁর কাছে বিস্বাদ লাগল আজ। জ্বলতে লাগল তার কণ্ঠ, তিক্ত হয়ে গেল জিহ্বা। পাত্রের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু পিকদানিতে ঢেলে দিয়ে জমিদার এলিয়ে দিলেন তাঁর দেহ নিজের শয্যায়।

"মথুর, সব তুলে ফেল !—তামাক দে।" প্রভুর আদেশ শুনে মথুর হতবাক হয়ে গেল। তাকিয়ায় কাৎ হয়ে শুয়ে যাদব চক্রবর্ত্তীর হঠাৎ মনে হল যেন অতীত বিলুপ্ত হয়েছে কালের অতল গর্ভে, বর্ত্তমানও প্রায় যায় যায়, ভবিষ্যৎ উঁকি দিচ্ছে সদর দরজা দিয়ে। ভবিষ্যৎকে যাদব চক্রবর্ত্তী দেখবার চেষ্টা করলেন—চেষ্টা করলেন কয়েকবার—কে যেন দরজার কাছ থেকে লুকিয়ে নিল নিজেকে !

"মথুর ! দেখ তো দরজার কাছে কে ?"—জমিদার চীৎকার করে উঠলেন। মথুর তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে খবর দিল যে, তাফু মিঞা অপেক্ষা করছেন বাইরে।

"একটা চেয়ার দে আমার সামনে। ডেকে দে কাকাবাবুকে।" মথুরের সঙ্গে তাফু মিঞা প্রবেশ করলেন বাবুর ঘরে। বাবুর ঠিক সম্মুখে একটা চেয়ারে বসল জমিদারের ম্যানেজার। তাফু মিঞার দিকে তাকালেন যাদব চক্রবর্ত্তী, সে মুখে দেখলেন—অতীত চলে গেছে, বর্ত্তমান চলে গেছে, ভবিষ্যৎ আসন পেতেছে সুদৃঢ়ভাবে। সেখানে তার আর উঁকি ঝুকি নাই।

"কী খবর, কাকাবাবু ? এই বর্ষায় ? আমারও মনে হচ্ছিল যেন আপনি এলেই ভাল হয় এখন। কী যেন একটা স্পষ্ট দেখবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।" বাবুর কথা শুনে বৃদ্ধ তাফু মিঞা অবাক হয়ে গেলেন, মনে মনে ভয়ও হল তাঁর।

"পরশু দিন অনেকগুলো বাকি খাজনা তামাদি হয়ে যাবে বাবু, অনেক টাকার ব্যাপার। কালই সদরে রওনা না হলে পরশু মামলাগুলো দায়ের করা যাবে না।"

"তামাদি—সব তামাদি হয়ে যাবে ? কত টাকা তামাদি হবে ?"

"তা প্রায় হাজার দুয়েক টাকা হবে বাবু। ইমদুর দরুনই

তো প্রায় হাজার টাকা হবে।" পুরাতন কর্ম্মচারীর সমবেদনা জমিদারের জন্য।

"দু-হাজার টাকা আদায়ের জন্য আরো দু-হাজার টাকা খরচ করতে হবে কাকাবাবু! অর্দ্ধেক যাবে উকিলের পেটে, অর্দ্ধেক আদালতের আমলা পেয়াদার পেটে। তার পর কিসের থেকে এই খরচটা উসুল করবেন?" বাবুর কথা শুনে ম্যানেজার স্তম্ভিত হয়ে গেল। জমিদারকে সে চেনে কিন্তু এ যেন তাঁর অন্য রূপ! এই কী ভবিষ্যতের রূপ?

"না করেও তো উপায় নেই বাবু। আমাদের সেস্, কালেক্টারী দেওয়ারও ত সময় বেশী নেই আর। ইমদুর তো কয়েক বছরের খাজনা তামাদিই হয়ে গেছে। প্রজারা টাকা না দিলে—"

"এই বন্যা! কোথা থেকে দেবে তারা? অনেকের ঘরে খাবার নেই, মাঠের ফসল গেছে ভেসে, ঘরে জল ঢুকছে সকলের শুনছি।"

"হুজুর! সরকার তো আমাদের টাকা মাফ্ দেবে না।"

"জানি—সরকার দূরে থাকে, তাই কালা ও অন্ধ। আমরা কী করে তা হই কাকাবাবু! সব জানি। সব বুঝি। আপনি ওদের সব খাজনা মাফ করে দিন। আসছে বছর দেখা যাবে!"

জমিদারের কথা শুনে তাফু মিঞা স্তব্ধ হয়ে গেল। সম্মুখের আলোটা যেন নির্ব্বাণোন্মুখ মনে হল। জ্ঞাতি শত্রু ইমদু, তার সম্পত্তির উপর তাফু মিঞা বহুদিন থেকে নজর দিয়ে বসে আছেন। দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও তার সম্মুখ থেকে ইমদুর স্বল্প খাজনার উর্ব্বর জমিগুলো অদৃশ্য হতে পারে নি।

"হাঁ, শুনুন। অনেক দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি। ইমদুর একটা মেয়ে আছে, শুনেছি সে মেয়েটি দেখতে শুনতে পরমা সুন্দরী। আপনার ছোট ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

কণ্ঠস্বরে অনুরোধের চেয়ে আদেশের সুরই যেন বেশী। বৃদ্ধ তাফু মিঞা চমকে উঠলেন।

সে তো ভালই হয় হুজুর, কিন্তু ছেলেটাকে পড়াব ভাবছি। এখন বিয়ে দিলে—

"বেশ তো পড়ান। সে তো আমাদের নীলুর সঙ্গেই পড়ে, বিয়ে দিলে কি পড়া হয় না? ও যদি পাশ করে তবে আমি কথা দিচ্ছি ওকে আর নীলুকে একসঙ্গে পড়াব কলেজে—যতদূর পারে ওরা পড়বে, সব খরচ আমার।"

"কথাবার্ত্তা হুজুর ঠিক হয়ে থাক, পড়া শেষ হলেই—"

"না, তা হয় না কাকাবাবু। তখন আমি ও আপনি নাও থাকতে পারি—ছেলের মত তখন স্বাধীন হয়ে যাবে। এতে আপনার লোকসান কোথায়? ইমতুর সম্পত্তি ভালই আছে, মেয়ে তার একটা অংশ পাবে, আমি বরং চেষ্টা করে তার ছেলে ও মেয়েকে আধা আধি লেখাপড়া করিয়ে দেব। আমিও যৌতুক দেব পঁচিশ বিঘা খামার ধানের জমি।"

জমিদারের কথা শুনে বিজ্ঞ জমিদারের বিজ্ঞতর আমলা তাঁর লাল দাড়িতে দু-একবার হাত বুলিয়ে মনে মনে অঙ্কের একটা হিসাব করে নিল। চোখ বন্ধ করে বাবুর খামার জমি ও ইমতুর জমির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বন্ধ চোখের তারা দুটি যেন চক্‌চক্‌ করে উঠল। তাফু মিঞা যাদব চক্রবর্ত্তীর অকৃত্রিম বড় বন্ধু, কিন্তু তার চেয়েও সে বড় বন্ধু তার নিজের।

সেখানেই বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহানারার সঙ্গে তাফু মিঞার ছেলে মাহ্‌মুদের বিয়ে হয়ে গেল। যাদব চক্রবর্ত্তী নিজে উপস্থিত থেকে সব আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিলেন, আশীর্ব্বাদ করলেন নবদম্পতীকে। দুই রাণীও সে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন। প্রজার বাড়ীর

বিবাহে রাণীদের উপস্থিতি এই প্রথম। বিবাহ-বাসর থেকে ফিরে এসে জমিদার সমস্ত রাত্রি সুরাপান করেছেন। সেদিন তাঁর আকণ্ঠ তৃপ্তি হয়েছিল।

যথাসময়ে নীলু, সাহজাদা ও মাহমুদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করল। কলকাতায় কলেজে পড়বার জন্য নীলু ও মাহমুদের সব ঠিক করে দিলেন যাদব চক্রবর্ত্তী। সাহজাদা থেকে গেল গ্রামে তার জমিজায়গা দেখবার জন্য। পাল মশায় মথুরকে সঙ্গে করে নীলু ও মাহ্‌মুদকে নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে মাস-খানেক থেকে পালমশায় ও মথুর ফিরে আসবে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে। যাত্রার দিন সকালে নীলু ও মাহ্‌মুদ দুই রাণীকে প্রণাম করল পা জড়িয়ে। ছোটরাণী নীলুকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে, চোখের জল অবাধে গড়িয়ে পড়ল তার মাথায়। বড়রাণীর চোখ দুটি তখন শুষ্ক, অর্থহীন, উত্তাপহীন। নীলু যখন তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াল তখন তাঁর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। তিনি নীলুর মাথায় হাত রাখতেও ভুলে গেলেন, হয়ত বা আশীর্ব্বাদ করতেও ভুলে গেলেন।

বাবুঘাটে নৌকা প্রস্তুত। জমিদার নিজে এসেছেন দু'জনকে তুলে দিতে। নীলু ও মাহ্‌মুদ তাঁকে প্রণাম করলে তিনি দু'জনকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নীলুর হাত ধরিয়ে দিলেন মাহ্‌মুদের হাতে। অদূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তাফু মিঞার ঘোলাটে দৃষ্টি যেন আরো স্তিমিত হয়ে এল। নৌকা ছেড়ে দিল।

নবগঙ্গার তীরে গ্রামখানা ছলছল করে উঠল।

দুই

নীলমাধব ও মাহ্‌মুদ মথুর ও পাল মশায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। পাল মশায়ের পুরাতন কলকাতা, কিন্তু অন্য সকলের কাছে নতুন পৃথিবী। নীলমাধব ও মাহমুদ প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম লিখাল, নীলমাধব বিজ্ঞানে ও মাহ্‌মুদ কলায়। দুইপথে দু'জনের একই দিকে যাত্রা আরম্ভ হল—একই উদ্দেশ্যের দিকে। চিন্তাধারা এক না হলেও লক্ষ্য একই। কলেজের সন্নিকটে নীলমাধব মথুরকে নিয়ে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের একটি ভাল মেসে আশ্রয় নিল। মাহ্‌মুদ আশ্রয় নিল কলুটোলার এক মুসলমান মেসে। দিন-কুড়ি সেখানে থেকে সকলকে স্থিতি করে দিয়ে পাল মশায় নিজের জিনিসপত্র কেনা-কাটা করে চলে গেলেন নিজের গহ্বরে। পুরাতন ফিরে গেল পুরাতনে, নতুন আঁকড়ে ধরল নতুনকে। কুড়ি দিনের ভিতরে পাল মশায় যথাসাধ্য মথুরকে কলকাতায় চোখ-কান ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করে গেলেন—যাতে প্রভু-পুত্রের কোন কষ্ট না হয়। মথুর বালক নয়, মথুর জমিদারের পুরাতন ভৃত্য। মথুর যাদব চক্রবর্ত্তীর ইসারায় এতদিন পাল তুলেছে, চোখ-কাণ ফোটা লোক সে, সুতরাং ফোটা চোখ-কাণকে একটুমাত্র সতর্ক করতে তার বেশী দেরী হল না, বিশেষ বেগ পেতেও হল না। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে সে কলকাতায় থেকে গেল। কলেজ একই, মেসও কাছাকাছি দু'জনের, গ্রামের নৈকট্য অটুট থেকে গেল এখানেও।

দু'জনের মেসই বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিপুষ্ট। তাই তাদের আবহাওয়া ভাল। সদস্য ছাত্রই সব, সুতরাং আবহাওয়াতে শুধু পড়াশুনারই গুঞ্জন। "মেস-মেম্বর চাই" ছাপ-মারা মেস নয়, তাই সে-মেসে শহরের মত আন্তর্জাতিক ছাপ নাই। মুড়ি মুড়কি এক হয়ে এক বিচিত্র সমাবেশ হয় নি। নীলমাধবের মেসটি কলেজ ষ্ট্রীট ও মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থান থেকে একটু দূরে, ঠিক পার্কটির সম্মুখে। মাহ্‌মুদের মেসটি একটু পিছনে পড়ে কলেজের দৃষ্টি থেকে। পরস্পর দৃষ্টির বাইরে থাকলেও গ্রামের সুরে তাদের মন দু'টি এখনও সন্নিকটেই থাকে। মাহ্‌মুদ অধিকাংশ সময় নীলমাধবের মেসেই থাকে। নিজের মেসে নীলমাধব একটি ছোট ঘর একাই পেয়েছে—ঘরটি তেতলায় ঠিক রাস্তার উপর। সেই ঘরে নীলু-রাজার সংসার গুছিয়ে দিয়েছে ভৃত্য-অভিভাবক মথুর। তারই একপাশে গুছিয়ে নিয়েছে নিজের অবস্থিতি। মথুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নীলু-রাজার সুখ সুবিধা ও পড়ার উপরও। বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় সে দু'টি বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন আদেশ পায়—বড়-মা বলেছেন যেন নীলুর কোন কষ্ট না হয় খাবার ও থাকার, বাবু বলেছেন নীলুর পড়াশুনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে। দু'জনের এই আদেশের সঙ্গে মথুরের নিজের অন্তরের স্নেহ মিশে যে-রূপ ধারণ করল, সে-রূপ নীলমাধবকে বেষ্টিত করে রাখল মাতার স্নেহের ও পিতার কর্ত্তব্যের অম্ল-মধুর বেষ্টনীতে। মথুর চতুর। সে মুড়ি ও মুড়কিতে পার্থক্য জানে। সে জানে বট গাছের চারা বড় হয়ে বট গাছই হবে এবং দশজনকে ছায়া দেবে নিজের আশ্রয়ে। আশ্রয় দেবে অগণন প্রাণীকে, পাখীকে নিজের বুকে। তাতে লক্ষ লক্ষ ফল হবে পাখীর আহারের জন্য—লক্ষ লক্ষ বট গাছ হবার জন্য নয়। সে এও জানে বেত-লতার চারা বড় হয়ে বেতই হবে, কাঁটা হবে তার সমস্ত গায়ে, কণ্টকিতদেশ জড়িয়ে ধরবে পাশের অন্য কোন ছোট

দুর্ব্বল গাছকে, ক্ষতবিক্ষত করবে তার সমস্ত শরীরকে, আশ্রয় দেবে দু-এক প্রকারের বিষাক্ত সাপকে। মথুর জানে রক্ত জলের চেয়ে ঘন। নীলমাধব বড় হ'য়ে জমিদারই হবে, মাহ্‌মুদ হবে তার নায়েব বা গোমস্তা। মথুরেব মনের এই অপ্রসারতার জন্য তাকে দোষারোপ করলেও সে কিন্তু দু'জনের উপরই সমান স্নেহ বিতরণ করত। তবে পার্থক্যের একটি রেখা সর্ব্বদা দু'জনের মধ্যে টেনে রাখবার চেষ্টা করত দু'জনেরই অলক্ষ্যে।

সেদিন অপরাহ্নে নীলু নিজের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল পথের দিকে তাকিয়ে। বিচিত্র সহর এই কলকাতা। যতই দেখছে ততই যেন বিচিত্রতর মনে হচ্ছে। গ্রামের কিশোর সহরে এসেছে। নদীর মাঝি যেন সমুদ্রে নামবার পূর্ব্বে তার রূপ দেখে, এবং তার গভীরতা অনুমান ক'রে আতঙ্কিত হচ্ছে। গ্রামের সৌন্দর্য্য নাই কলকাতায়, গ্রামের স্নিগ্ধতা নাই এই সহরে। সর্ব্বত্র যেন কেমন একটা উগ্রতার ভাব, একটা কাঠিন্যের স্পর্শ। গ্রামের স্রোত একটা শান্ত নদীর স্রোত—সে স্রোত একটানা বহিয়া যায়। এক সুরে যেন বাঁধা থাকে সে স্রোত। তার ক্ষুব্ধতায়, তার চঞ্চলতায় নিজেকে খণ্ড বিখণ্ড করে না। সহরের এই স্রোত যেন সমুদ্রের স্রোত,—এ স্রোত একটানা নয়, এক সুরে বাঁধা নয়। এ স্রোত নিজেই ক্ষুব্ধ, নিজেই বিক্ষুব্ধ। তার গতিতে সে নিজেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এগিয়েও যায়, আবার পিছিয়েও আসে। তার গতি আছে কিন্তু অগ্রগতি নাই। মহানগরী তার উত্তাল তরঙ্গে শীর্ষে শীর্ষে হয়ত ভাবতে থাকে যে সে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সে যদি ক্ষণিকের জন্য পশ্চাতে তাকিয়ে দেখে, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, তার গতি অগ্রগতি নয়—তার গতি স্থিতি-নৃত্য মাত্র! নীলমাধব স্থির দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নীচের জনস্রোতের দিকে। পিপীলিকার সারির মত একটানা' স্রোত।

ক্ষুদ্র পিপীলিকাও বিপরীতমুখী স্বজাতির সঙ্গে দেখা হলে ক্ষণিকের জন্য ভাবে ও ভাষার আদান-প্রদান করে, কিন্তু এই মহানগরীর পিপীলিকাদের সে অবসর নাই, সেটুকু ধৈর্য্যও নাই। ফুটপাথে লোক, পথে যানবাহন যেন গতির প্রতিযোগিতা চালিয়ে চলেছে। অন্যের দিকে দূরে থাক, তাদের বোধ হয় নিজের দিকে দৃষ্টি দেবারও অবসর নাই। যে অন্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনা, সে নিজের দিকেও দৃষ্টি দিতে পারে না, তার অন্ধ-দৃষ্টি। নীলুর কলেজটি কাটা কাটা দেখা যাচ্ছে তার ঘর থেকে। পার্কের সম্মুখ অংশের বিদ্যাসাগরের মর্ম্মর মূর্ত্তিটি যেন কাতরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্মুখের বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধের দিকে। মূর্ত্তি তার নির্ব্বাক মর্ম্মর হয়ে যেন বেঁচে গেছে, দৃষ্টি তাঁর স্তব্ধ হয়ে যেন শান্তি পেয়েছে, কর্ণ তাঁর রুদ্ধ হয়ে যেন পরিত্রাণ পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের বাংলার এ রূপ তিনি আজ জীবন্ত অবস্থায় দেখলে ঠিক এইরূপই স্তব্ধ ও মর্ম্মর মূর্ত্তি হয়ে যেতেন। মর্ম্মর মূর্ত্তি তার নির্ম্মাতাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছে তাকে প্রাণহীন মর্ম্মর মূর্ত্তিতে পরিণত করবার জন্য। পার্কের লোহার রেলিং-এর গায়ে বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন প্রকারের কাপড় জামা টাঙ্গান। কি আছে আর কি নাই! সামান্য গামছা থেকে মূল্যবান শাড়ী জামা পর্য্যন্ত। তাদের বিক্রেতারা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনস্রোতের দিকে। সে স্রোত থেকে চেষ্টা করছে ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে—কেউ সার্থক হচ্ছে, কেউ নিরাশ হচ্ছে। স্রোতের ভিতর থেকে যখনই কেউ সেদিকে এগিয়ে আসছে তখনই বিক্রেতারা বলে উঠছে—"এই যে, আসুন মা—এদিকে আসুন। খুব সস্তা মা—খুব সস্তা! সুন্দর সুন্দর শাড়ী, ব্লাউজ, বডিজ, পেটিকোট—এইতো বাবু—এদিকে। কত সস্তায় গেঞ্জী দেখুন, ডজন হিসাবে নিলে একেবারে জলের দর!" দর জলই হোক আর আগুনই হোক, ক্রেতার অভাব নাই।

ক্রেতার চেয়ে দর্শকের ভিড় বেশী, কেনার চেয়ে বাছাইএর চাপ বেশী।

"কী মা, এটা পছন্দ হল না? আরো আছে—অনেক ডিজাইনের আছে—দেখুন—" একটি মেয়ে অনেকক্ষণ সেখানে কতকগুলি ব্লাউজ দেখছিল, বহুক্ষণ বহু জামা দেখে সঙ্গে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা মুখের ভাব করল। ধীরে ধীরে নামবার চেষ্টা করল পথে। বিক্রেতা শেষ অনুরোধ জানাল তাকে।

"পছন্দ ত হয়েছে বাবু, কিন্তু তুমি যা দাম বলচ—একেবারে আগুন—"

"আপনি কী দাম দেবেন বলুন, মা!"

"কী বলব বাবু! তোমার ও দামের উপর আর আমার কোন আক্কেলই খাটছে না—" মেয়েটি আঁচলটি ঠিক করে কাঁধের উপর গুছিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল পথে। পাশের একটা ছোকরা দোকানদার বলে উঠল,—"এই যে মা—এদিকে আসুন, একেবারে জলের দরে ছেড়ে দিতে বসেছি।" একটানা স্রোত,—আসা-যাওয়ারও একটানা স্রোত। পুঁটিরামের খাবারের দোকানের সম্মুখে ডাষ্টবিন দুটি ভুক্তাবশিষ্ট শালপাতায় ভ'রে উঠেছে। একটির পাশে কয়েকটি কুকুর চঞ্চলভাবে খেয়ে চলেছে, থেকে থেকে কামড়া কামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে। অন্যটিতে দু-হাত ঢুকিয়ে একটি প্রায়-নগ্ন উন্মাদ বেছে চলেছে ভুক্তাবশিষ্ট। তার পাশে একটি অর্দ্ধ-নগ্ন কঙ্কালসার স্ত্রীলোক বেছে চলেছে খাদ্যকণা এক হাতে। কেউ কাহারো দিকে দৃক্‌পাত করছে না, কামড়া কামড়ি করছে না—করবার সময়ও নাই, দরকারও নাই। স্ত্রীলোকটিকে এখনো কয়েকটি ডাষ্টবিন দেখতে হবে। উন্মাদটির পেট ভ'রে গেছে। ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি থেকে দলে দলে সোসাইটির সম্পদ বের হয়ে আসছে। একটি দম্পতি এসে

উঠলেন কালো একটি বড় মোটরে। মোটরটি ডাষ্টবিন দুটির গা ঘেঁষে চললো। স্ত্রীলোকটি চমকে উঠল, উন্মাদটি নির্ব্বিকার। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে দলে দলে ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে আসছে। বিদ্যাসাগরের নির্ব্বাক মূর্ত্তি তাদের দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নীলমাধবের দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠল সেই দিন—যে-দিন সেও সেই সৌধ থেকে নেমে আসতে পারবে।

মহানগরীর এই রূপের কতক অর্থ নীলমাধব বুঝতে পারল, কতক পারল না। কিছু দৃশ্য তার কিশোর মনের উপর মুহূর্ত্তের জন্য ছায়াপাত করচে, কিছু দৃশ্য তার মনকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারল না।

"রাজাবাবু! অত ঝুঁকে দাঁড়িও না। দৈবের হাত পা নেই। এসো ভিতরে জল খাবার খেয়ে নাও—" মথুরের ডাকে নীলুর ভাব কাটল, সে ফিরে এল বাস্তব পৃথিবীতে। ফিরে এল ঘরের ভিতরে। সেখানে মথুর তার রাজাবাবুর বৈকালিন জলখাবার গুছিয়ে রেখেছে, এক গেলাস দুধ, কিছু ফল ও মুড়কি। নীলু মুড়কী খেতে ভালবাসে।

"মথুর-কা! তুমি আমাকে রাজাবাবু বলো না এখানে। বড় লজ্জা করে। আমি কী রাজা?—আমি রাজাও না, বাবুও না।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে পরে। লজ্জা কিসের বাবু বুঝি না। এখন তুমি খেয়ে নাও তো! দুধটুকু আগে খাও, ওটা খেতেই তোমার যত ফষ্টি নষ্টি হবে শেষে! শেষে বলবে সর লেগে আছে, নয়ত মিষ্টি হয়নি—নয়ত বলবে কেমন গন্ধ।" মথুর দুধের গ্লাসটি নীলুর মুখের কাছে ধরল। দুধ খাওয়া যেন নীলুর এক শাস্তি, বাড়ীর অমন অমৃতের মত দুধই তার কাছে বিষের মত লাগত, আর এ-তো কলকাতার দুধ। দুধ-খাওয়ান ছিল বড়-মার এক পর্ব্ব, এখন পড়েছে মথুরের স্কন্ধে।

"কাল থেকে আর দুধ খাব না মথুর-কা!"—প্রতিদিনই নীলু প্রতিবাদ করে এসেছে।

"তাহলে আমি চলে যাব বাবু! বড়-মাকে কি করে মুখ দেখাব?" নীলু মুখখানা বেচারীর মত করে দুধটুকু আগে খায়। ঘরে প্রবেশ করে মাহ্‌মুদ। কলকাতায় এসে মাহ্‌মুদের চেহারা খুলেছে, সে গ্রামের জন্য মন উদাস করে তাকিয়ে থাকে না। পথের দিকে চেয়ে রাস্তায় কোন মহিলাকে দেখে নীলুর মত তার মনে পড়ে না বড়-মাকে। দুধ খাবার সময় মনে পড়ে না বড়-মার চেষ্টা, ঘুষ দেওয়া, কৃত্রিম রোষ! কলকাতা যেন মাহ্‌মুদকে আশ্চর্য্যই করেছে, পল্লীর প্রদীপের চেয়ে কলকাতার বিদ্যুৎ তার ভাল লেগেছে। আঁঠেলের বনে দোয়েলের শিষের চেয়ে তার ভাল লেগেছে এখানকার মোটরের শিষ!

"মথুর-কা, আমাকে কিছু খেতে দেবে না?"

"দেব বৈকি বড় মিঞা! ঐখানটা বস। এক্ষুণি দিচ্ছি! তুমি আজ খেয়ে আসনি?"

"এসেছি কাকা! আবার ক্ষিদে পেয়েছে।" মথুর মাহ্‌মুদকে বড় মিঞা বলে ডাকত, মাহ্‌মুদ তাকে বলত মথুর-কা। নীলুর আসনের থেকে খানিকটা দূরে মথুর মাহ্‌মুদকে খেতে দিল শাল পাতায় করে। এ পার্থক্যটুকু মথুর জানে ও রাখে। নীলু সেটুকু বুঝতে পারে কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় না।

"মথুর-কা! আজ একটা সিনেমায় চল না—ভাল বাংলা বই আছে এক জায়গায়।" মাহ্‌মুদ খেতে খেতে মথুরকে অনুরোধ করে, মথুর সে অনুরোধ শুনে তার মুখের দিকে তাকায়।

"সিনেমা! এখানে কী সিনেমা দেখতে এসেছ? পড়াশুনো শেষ করে নাও, তারপর জীবন ভ'র সিনেমা দেখো! কেউ মানা করবে না বড় মিঞা। সন্ধ্যের পর গিয়ে পড়তে ব'স—সিনেমাও

না, এখানে গল্পও না। সুপারিণ বড় কড়া লোক!" মথুর জানিয়ে দিল যে মেসের সুপারিণ অর্থাৎ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বড় কড়া লোক। সন্ধ্যার পর মথুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে নীলমাধবের পড়ার উপর, তখন সে মাহ্‌মুদকে সেখানে থাকবার অনুমতিও দেয় না। এ আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি নীলমাধবেরও নাই!

কলকাতায় সন্ধ্যা লাগল। এখানে সন্ধ্যা আসে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে, জনস্রোতের ধারা বৃদ্ধিতে, অপরাধীদের কর্ম্ম-মুখরতায়। গ্রামের সন্ধ্যা নামে শান্তশ্রী প্রদীপ-শিখায়, মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টায় ও গৃহলক্ষ্মীর শঙ্খধ্বনিতে!

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলে গেল মানুষের অলক্ষ্যে। কম্পিত মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবী ঘুরে গেল মানুষের সময়কে ভ্রূক্ষেপ না করে। চোখের পলকে যেন কেটে গেল দুটি বৎসর। নীলমাধব ও মাহ্‌মুদ দু'জনেই পাশ করল। নীলু গেল বিজ্ঞানের উচ্চশ্রেণীতে, মাহ্‌মুদ গেল কলার আর এক ধাপ উঁচুতে। কলেজের পরিবর্ত্তন হল না,—পরিবর্ত্তন হল তাদের মনের ও বুদ্ধির। কলকাতায় দুই বৎসর স্থিতির ফলে নীলমাধবের জড়তা ভেঙ্গেছে, এবং মাহ্‌মুদের ফুটেছে চোখ কাণ—পেয়েছে ময়না-কপ্‌চানি ভাষা। পুকুরের মাছ নদীর মাছের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বসবাস করতে শিখেছে। কলকাতায় বন্ধুর অভাব হয় না। ভাঙ্গা-গড়ার সহর এই মহানগরী, স্থিতির চেয়ে যার গতিই বেশী, গড়ার চেয়ে যেখানে ভাঙ্গাই বেশী সেখানে বন্ধুর স্রোত অবারিত থাকে। জীবনের পথে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়, মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে তারা লক্ষ্যে চলে যায়। শূন্য স্থান শূন্য থাকতে পায় না, তবে পূর্ণও যেন হয় না!

নীলমাধব সেই মেসেই থাকে। তবে মথুর চলে গেছে দেশে তার বাবুর কাছে, কারণ নীলু এখন মহানগরীতে একা থাকার মত

উপযুক্ত হয়ে গেছে। কলকাতায় তার যত বন্ধু হয়েছিল তাদের সংখ্যা খুব কম, মথুরের দৃষ্টির সম্মুখে তারা ব্যাংএর ছাতার মত গজিয়ে উঠেতে পারে নি। মথুরের মতামতের আঘাতে কয়েকজন বুদ্‌বুদের মত ভেসে উঠে অকালেই তলিয়ে গিয়েছে। যে দু-একজন থেকে গিয়েছিল তার মধ্যে মাত্র একজনই মথুরকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, এবং মথুরকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলেই সে নীলুর জীবনের কক্ষপথে শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায়। চন্দ্রের মত সে সূর্য্যের বুকের উপর ছায়াপাত করে তাকে রাহুগ্রস্ত করতে চায় নি। শেষ পর্য্যন্ত সে-ই শুধু নীলুর জীবনের উপর রেখাপাত করে গেছে, ছায়াপাত করে নি। ধীরে ধীরে আব্বাস নীলুর সন্নিকটে এসে গেল।

"মথুর-কা, আব্বাসকে তো তুমি দূরে দূরে রাখতে চাও না, ওর ছোঁয়াছুঁয়িও তুমি অত মান না। অথচ মাহ্‌মুদকে তুমি যেন এড়িয়েই চলতে চাও। তোমার ব্যাপার বোঝা যায় না মথুর-কা!" শেষের দিকে নীলু একদিন মথুরকে প্রশ্ন করেছিল।

"জিনিসটা আমিও ঠিক বুঝতে পারিনে রাজাবাবু! আব্বাসের আচার-ব্যাভার, রীত সব যেন আমার কেমন অন্যরকম মনে হয়। কী হবে ও মুসলমান হলে—তুমি দেখে নিও রাজাবাবু ও-ই তোমার যথার্থ বন্ধু হবে। আব্বাস তোমাকে সত্যিই ভালবাসে রাজাবাবু, একদিন আমার কথা মিলিয়ে নিও।" মথুরের কথা শুনে নীলু তখন হেসেছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে নীলমাধব মথুরের কথাকে সত্যিই মিলিয়ে নেবার অবকাশ পেয়েছিল,—অবকাশ পেয়েছিল কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ দু'বৎসর আব্বাস নীলুকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, দু'জনে একসঙ্গে চলাফেরা করেছে, বুনতে চেষ্টা করেছে নিজেদের ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মজাল, জড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করেছে দু'জনেই সেই জালের আবর্ত্তে। আব্বাসের কথাবার্ত্তায় চালচলনে

নীলু বুঝতে পারে নি তার অবস্থার কথা, বুঝতে পারেনি তার পারিবারিক গতির কথা ও সংসারের স্থিতির কথা। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে আব্বাসকে ধনীপুত্র বলে মনে হয় না, আবার দরিদ্র বলেও সন্দেহ হয় না। কলকাতার অসংখ্য মধ্যবিত্ত ঘরের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বলেই মনে হয় আব্বাসকে। আব্বাসের বেশভূষা থেকে নীলমাধব তার অবস্থার কথা অনেক ভেবেছে, কল্পনা করেছে মনে মনে নানাপ্রকারের জাল। বুনেছে আর ছিন্ন করেছে, এবং আবার নতুন করে বুনেছে। এই ভাবেই কেটে গেছে দীর্ঘ দু'বৎসর সে জাল বুনতে বুনতে আর ছিঁড়তে ছিঁড়তে।

বর্ষণমুখর বিষণ্ণ এক অপরাহ্ন। নীলুর মেসের ঘরে সে আর আব্বাস বসে গ্রন্থিহীন গল্প করে চলেছিল বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে। কলকাতার বর্ষা বড় বিশ্রী, তার না আছে রূপ না আছে গুণ। অন্যসময় মহনগরীকে আপাত দৃষ্টিতে মসৃণ দেখা যায় কিন্তু সে যে কত ক্লেদপূর্ণ, এবং তার অন্তর-বাহির যে কত আবর্জ্জনায় ভরা তা প্রকট হয়ে যায় বর্ষায়। বর্ষায় শহরের অন্তরের ময়লা ধুয়ে চলে আসে বাহিরে সকলের সম্মুখে, প্রকাশ্যের অন্তরের আবর্জ্জনা ভেসে ওঠে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে। আবৃত রূপ অনাবৃত হয়ে পড়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে।

"বি. এস. সি. পাশ করে তুই কী করবি নীলু?"

আব্বাসের এ প্রশ্নের উত্তর নীলু সহসা দিতে পারল না, সে কী করবে এখনো নিজেই স্থির করে উঠতে পারে নি। নিজের ভবিষ্যতকে সে অবসর মত নানা বর্ণে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছে, একটিও রঙ যখন তার মনোমত হয় নি তখন সে সেটাকে রামধনুর বর্ণে চিত্রিত করে আনন্দ পেয়েছে, চেষ্টা করেছে, ইন্দ্র-ধনুর সাতটি রঙকেই রাখতে, চেষ্টা করেছে তার ভিতর কোন একটি রঙকে বেছে নিতে। কিন্তু এই বর্ণ-নির্ব্বাচন করেই কাটিয়েছে নীল-

মাধব, নির্ব্বাচনে সফলকাম না হয়ে সে পেয়েছে শুধু আনন্দ। সুতরাং সেদিন বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর সে সহসা দিতে পারল না।

"কী করব, ঠিক করিনি এখনও ভাই। বিলেত যাবার একটা স্বপ্ন দেখছি।"

"এটা আর তোর কাছে স্বপ্ন নয়—তোর কী টাকার অভাব! তুই কোথাও যাবিনে শেষ পর্য্যন্ত, জমিদার হ'য়েই বসবি বাবার সিংহাসনে।"

"আর যাই হই আব্বাস জমিদার আমি হব না। জমাদার হতে হয় শেষ পর্য্যন্ত সেও ভাল। জমিদার হবার সখ আমার একেবারে মিটে গেছে।"

"তবে জমিদারিটা কী করবি? তোর তো আর ভাই নেই।"

"বিলিয়ে দেব সকলকে। শেষ পর্য্যন্ত ও জিনিস থাকবে না আব্বাস—থাকতে পারে না।"

"কেন—?"

"কারণ তার ভিত্তি বড় কাঁচা! যাক বাজে কথা। তোর বাড়ী কবে নিয়ে যাবি বল?"

এ প্রশ্নে আব্বাস আবার উদাস হল। নীলমাধব যতদিন তাকে এ প্রশ্ন করেছে ততদিনই আব্বাস সেটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার মূলসূত্র নীলমাধব জানবার চেষ্টা করে নাই, তার মনে কোন সন্দেহও জাগে নাই। আজ আবার সেই প্রশ্ন। গত পূজার ছুটিতে নীলমাধব আব্বাসকে তার দেশে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের বাড়ীতে অবশ্য রাখতে পারে নি,—রেখেছিল তার অতিথিশালায়। আব্বাস অধিকাংশ দিনই কাটিয়েছে মাহ্মুদের ও সাহজাদার বাড়ীতে। যাদব চক্রবর্ত্তী ও তার দুই রাণী আব্বাসকে যে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন, তার স্মৃতি আব্বাসকে যেন ক্রীতদাস করে রেখেছে। বাংলার

পল্লীতে যে এত স্নেহ, সে স্নেহ যে এত অনাবিল, সে স্নেহ যে বর্ষার ধারার মত জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মাথার ওপর পড়তে পারে কলকাতার আব্বাসের তা জানা ছিল না। বাংলার আর এক রূপ তার কাছে উন্মোচিত হ'ল। নীলমাধব আবার আজ সেই প্রশ্ন করল।

"এবার নিয়ে যাব একদিন—কিন্তু যাবার আগে আমার কাছে তোকে একটা কথা দিতে হবে।"

"কথা মানে—প্রতিজ্ঞা ?"

"অনেকটা তাই। যদি কথা দিতে পারিস যে আমার বাড়ীতে যাবার পর আমাকে তুই এমনি ভালবাসবি—আমার ওপর তোর ঘৃণা হবে না—তবেই নিয়ে যাব।"

বন্ধুর কথাগুলোকে নীলু অন্য চোখে দেখল না, সন্দেহ করল হয়তো আব্বাস তার দারিদ্র্যের কথা মনে করেই কথাগুলো বলেছে, নীলুর দুঃখ হ'ল তার কথা শুনে।

"আব্বাস! আমাকে তুই ভুল চিনেছিস তা'হলে। আমি বন্ধুকে ভালবাসি, তার অবস্থাকে ভালবাসি না,—ঘৃণাও করি না। লোকের অবস্থাকে গ্রহণ করে নিতে হয়—ঘৃণা করতে নেই। কথা দিলাম তোকে। কবে নিয়ে যাবি বল ? মাহ্‌মুদকে খবর দি!"

"মাহ্‌মুদ এখন থাক—আগে তুই চল্‌তো!"

"কেন ? মাহ্‌মুদে তোর আপত্তি আছে—?"

"হ্যাঁ, একটু আছে।" আব্বাসের কথায় নীলু যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। কথাগুলো তার কাছে রহস্যাবৃত হ'য়ে গেল আবার।

নীলমাধবের কথাকে আব্বাস এতদিন এড়িয়ে চলেছে, আর এড়িয়ে চলতে তার স্তব্ধ মন লজ্জিত হয়ে উঠল। সেদিন রাত্রে সে স্থির করল তার পিতাকে কথাটা বলবে এবং তাঁর অনুমতি নেবে।

আব্বাসের পিতা নীলমাধবের নাম শুনেছে, শুনেছে তার অবস্থার ও স্বভাবের কথা—থেকে থেকে—ক্ষণে ক্ষণে।

"বাবা, অনেকদিন থেকে নীলু আমাদের বাড়ী আসতে চাচ্ছে, একদিন আনব তাকে? তোমার যদি মত হয়।"

নীলুকে আনবার জন্য পুত্রের এই প্রথম অনুরোধ। নিজাম কথাটা শুনল, ক্ষণিকের মধ্যে ভেবে নিল সে-বিষয়ে, মুহূর্ত্তে নিজের মনে সমালোচনা করে নিল নীলুর বিষয়ে—গত এক-বছর ধরে যা শুনেছে সে।

"নিয়ে আয় তাকে। ছেলেটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। যাই হোক আর একবার বাজিয়ে তবে আনিস।"

মৌলালীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে এক জীর্ণ দ্বিতল পাকা বাড়ীতে নিজামের সংসার। সংসারে তার সে নিজে, আব্বাস ও মেয়ে নীলা। দ্বিতলে তাদের বসবাস, নীচের তলায় নিজামের কারবার। নীচের তলার একটি ঘরে নিজাম ছোট একটি মুদিখানার দোকান সাজিয়ে রেখেছে। দোকানটির সাজসজ্জার দিকেই নিজামের দৃষ্টি বেশী, তার ক্রেতার দিকে নয়। মহানগরীর দস্যু-তস্করদের কোন বিশিষ্ট দলের নেতা নিজাম। কবে থেকে সে-ব্যবসায়ে নিজাম হাত দিয়েছে তা সে জানে, কিন্তু সে ইতিহাস মনে করতে তার ভাল লাগে না। যদি কখনো মনে পড়ে, তবে সেটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য নীলার কাছে গিয়ে সে আত্মসমর্পণ করে। নীলার কোলে শুয়ে পড়ে ছোট একটা শিশুর মত, কাতর স্বরে বলে—"মা, একটা গান শোনাবি না?" নীলা পিতার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলায় আর মনে মনে গুন-গুন করে, গুনগুন ক্রমে ক্রমে গানের রূপ ধরে, ধীরে ধীরে ভাষা পায়। গান যখন ভাষায় এসে উপস্থিত হয় তখন নিজাম নীলার কোলে অসহায়ের মত ঘুমিয়ে পড়েছে।

মহানগরীর ভীতিপ্রদ দস্যু-সর্দ্দার একটি অসহায় শিশুর মত কন্যার কোলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে। নীলা স্নেহের চোখে তাকিয়ে থাকে তার পিতার মুখের দিকে। এই লোককে দেখে লোকে এত ভয় পায়? নীলার ঠোঁটের কোণে এক টুকরা হাসি ফুটে ওঠে! অসহায়ের মত ঘুমিয়ে পড়ে দস্যু-সর্দ্দার নিজাম! নিজামের সব-চেয়ে দুর্ব্বলতা তার কন্যা নীলার ওপর। তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত হিংসা, দুর্দ্দান্ত প্রতাপ সেখানে এসে যেন মূষিক শাবকের রূপ ধারণ করে, তাপ হয়ে যায় তুহিন শীতল। কী জানি কেন, নিজাম নিজের পূর্ব্ব-ইতিহাস ভাবতে ভয় পায়, সর্ব্বদা সে ছবি রাখতে চায় নিজের মানস চক্ষের বহির্ভূত করে। সে ছবিতে সে বিভীষিকা দেখে!

নীলা আব্বাসের ছোট বোন, ভাইএর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট এবং নিজামের শেষ সন্তান। নীলা সুন্দরী,—অসামান্যা সুন্দরী। দস্যুর ঘরে এমন সুন্দরী লোকের মনে সন্দেহই জাগরিত করে তোলে,—মনের কোণে তার অস্তিত্বের অঙ্কুরটিকে জানবার জন্য একটা বিশিষ্ট আগ্রহ জাগায়। রুক্ষ কদাকার নিজামের ঘরে নীলার শুধু জন্ম নয়—তার উপস্থিতিই সন্দেহজনক। নিজামের বলিষ্ঠ দেহ প্রতি স্তরে স্তরে রুক্ষতা, দুর্দ্দমতা ও হিংসারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। তাকে দেখে মনে হয় যে—তার কেশাগ্র থেকে পায়ের নখর পর্য্যন্ত কোথাও একবিন্দু রস নাই—আছে শুধু যুদ্ধের ছাপ, আছে শুধু নির্ম্মমতার প্রতিচ্ছবি। এই দেহের ফল যে নীলা, তাহা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। যৌবন-উদ্বেলিতা নীলার কেশাগ্র থেকে পায়ের নখর পর্য্যন্ত শুধু রূপই নাই—সে রূপ শান্ত-শ্রী, সে রূপ পরিপূর্ণ। আবিল-জলভরা চঞ্চলা নদী নীলা নয়,—নীলা মত্ত-ময়ী ঝর্ণা-উদ্ভূতা স্রোতময়ী নদী। তার স্বচ্ছ জলে পঙ্কিলতা নাই, তার জলের স্বচ্ছতায় অন্তর পর্য্যন্ত দেখা যায়। স্রোত আছে কিন্তু ঘূর্ণী নাই, জল আছে কিন্তু তাতে জটিলতা নাই, পার আছে কিন্তু সে

পারে পঙ্ক নাই। নীলা সেই নদী—যে নদীর বুকে নৌকা চলে না, যে নদী পারের লোককে শুধু আকর্ষণ করে। সে নদীতে স্নান করা চলে কিন্তু আবগাহন করা যায় না। নীলার সেই রূপ। নিজামের দিকে তাকালে নীলাকে পঙ্কজা মনে হয়। আব্বাসকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মনে হয়। নিজামের প্রতাপ অন্তর্ব্বাটিতে এসে পৌঁছতে পারে না—নীলার কাছে সে নিঃস্ব, আব্বাসের কাছে সাধারণ একজন বাঙ্গালী পিতা। আব্বাসের ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

সায়াহ্নের শেষের দিকে একদিন আব্বাস নীলুকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল। এই দুই বৎসরে নীলু মহানগরীর অনেক পথে, অনেক রাস্তায় ঘুরেছে কিন্তু এমন ঘূর্ণীপাকের পল্লীতে সে কখনো আসেনি। একা ছেড়ে দিলে নীলু আব্বাসের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় আর পড়তে পারবে না। গোলক ধাঁধাঁয় প্রবেশের মত নীলু আব্বাসের ছায়া অনুসরণ করে এসে উপস্থিত হল নিজামের বাড়ীতে। আব্বাস যখন নীলুকে তার পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তখন নীলু গলির বক্রতার চেয়েও বিস্মিত হল নিজামের চেহারা দেখে। প্রথমে যেন সে কিঞ্চিৎ শিউরেই উঠল। নীলু তাড়াতাড়ি নিজামের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

“এ কী করলে তুমি! নিজামের কর্কশ ও বিস্মিত কণ্ঠস্বর।” “বামুনের ছেলে হয়ে তুমি—”

“তা জানি কাকু! বন্ধুর বাবার জাত থাকে না, বন্ধুর বাবা গুরুজনই হয়, বিশেষ যে বন্ধু নিজের ভাই-এর মত। আব্বাসের বাবা আমার কাছে মুসলমান হতে পারে না কাকু!” দস্যু-জীবনে নিজাম অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছে, বহু লোকের বিভিন্ন আবহাওয়ায় শুনেছে সে বহু কথা, কিন্তু এমন কথা বোধ হয় সে কোথাও শোনে নাই। নীলমাধবের

কথা পুত্রের কথার মত নিজামের মোটা চামড়ার উপর যেন একটা শিহরণ এনে দিল। সে শিহরণ যেন তার অন্তরে কিঞ্চিৎ আঘাত করল, স্পর্শ করল তার ধমনীর কালো রক্তকে। প্রথম স্পর্শেই বিগলিত হবার মত ধাতুতে নিজামের দেহাবরণ নয়—তবুও সে খুশী হ'ল।

"খুশী হলাম তোমার কথা শুনে। বাসু তোমাকে সত্যিই ভাই-এর মত ভালবাসে—তার মুখে তো তোমার কথা আর ফুরোতেই চায় না—!"

নিজামের কথায় আব্বাস নীলুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে, সে কিছু বিস্মিত হয়েছে। একটু হেসে বলল—"বাবা আমাকে বাড়ীতে বাসু বলেই ডাকে। আব্বাস থেকে বাসু হ'য়ে গেছি।" এতক্ষণে নীলু স্থির হল। "কখন কখন বাবা আমাকে বাসুদেব বলেও ডাকেন। আবার কখনো কখনো আব্বাস মিঞা বলেও ডাকেন—কিছু ঠিক নেই।" এতগুলো কথা আব্বাস বলে গেল, কিন্তু তার কোন উত্তর পাওয়া গেল না নিজামের কাছ থেকে। নির্ব্বিকার ভাবে নিজাম আব্বাসকে বলল, নীলুকে ভিতরে নিয়ে যাও।

"নীলুকে ভিতরে নীচের ঘরে বসাও আব্বাস। আমি একটু পরে আসছি। আমার মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও তোমার বন্ধুকে"—শেষের কথাগুলো আব্বাসকে বিস্ময়াবিষ্ট করে দিল। নীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি নিজাম তাকেই দেয় যে তার একান্ত আপন। দস্যু সর্দ্দার নিজাম কন্যাকে মহীয়সী নারী করে প্রতিপালিত করেছে, তার আবহাওয়াকে মুহূর্ত্তের জন্য বিষাক্ত হতে দেয় নি কোন দিন। নিজামের অন্তর্ব্বাটি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথিবী বহির্ব্বাটি থেকে। নিজাম নিজেই যখন সেই অন্দরমহলে যায় তখন সে বহির্জগতের সমস্ত ইতিহাস যায় ভুলে, সেখানকার

কোন কথা সে মনে করতেও চায় না পাছে নীলার পৃথিবী কোনক্রমে কলুষিত হয়। সর্দ্দার অন্দরে থাকলে চেলাদেরও আদেশ নাই তাকে খবর দেওয়ার। নিজাম যেন দুই পৃথিবীতে বাস করে।

অন্দরমহলে প্রবেশ করবার সময় নীলু বুঝতে পারল যে, পথ চেনা না থাকলে একা সে মহলে প্রবেশ করা বা প্রবেশ করে পথ চিনে বেরিয়ে আসা নবাগতের পক্ষে সম্ভব নয়। আব্বাস নীলুকে সঙ্গে করে একটি সজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। সাধারণ আসবাব দিয়া ঘরটি সাজান। আসবাব সাধারণ হলেও সেগুলির পরিচ্ছন্নতা সুরুচিরই পরিচয় দিচ্ছিল।

"একটু বস ভাই এখানে—তোকে বসাবার মত জায়গা নেই আমার বাড়ীতে। তোর বাড়ী কত সুন্দর দেখে এসেছি তো!"

"বেশী বাজে কথা বলিস নে আব্বাস! তোর মুখে শুকনো ভদ্রতা আশা করি নে আমি! আবার যদি বলিস তবে বেরিয়ে চলে যাব এক্ষুণি!"

"বেরিয়ে যেতে পারবি?"—আব্বাস হেসে হাওয়াকে তরল করে দেয়। "চা খাবি তো একটু!"

"নিশ্চয়ই খাব। শুধু চায়ে হবে না, ক্ষিদেও পেয়েছে সেটাও মনে রাখিস কিন্তু। জানিস তো আমি বাজারের খাবার খাইনে।"

"তা জানি—তবে বোধ হয় তোকে হরিমটরই খেতে হ'ল। সন্ধ্যা আহ্নিক না করেও তো খাসনে—সন্ধ্যেও তো হয়ে এসেছে!" আব্বাসের কথা শুনে নীলু হেসে উঠল।

"না খাওয়াবার একটা ভাল ছুতো বের করেছিস। মিঞার বাড়ীতে সন্ধ্যা আহ্নিক করব কিরে? মনে মনে একটা কিছু করে নেব—তবুও খাব। তুই যা—ব্যবস্থা কর!"

আব্বাস হাসতে হাসতে উপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আব্বাস নীলাকে সঙ্গে করে নেমে এল নীচে। নীলা এসে নীলুর সম্মুখে

দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে নিল তার মুখের দিকে। যেন কতদিনের পরিচিত মুখ। কোথায় যেন তাকে দেখেছে নীলা! সে নত হয়ে নীলুর পদধূলি নিল। নীলুর অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে আশীর্ব্বাণী বের হল—

"রাজরানী হও তুমি"—আশীর্ব্বাদ শুনে নীলা মৃদু হাসল। হাসির কথাই যে!

"কী নাম তোমার—?"

"নীলা—নীলা দেবী!" নাম শুনে নীলু যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। আব্বাসের ভগ্নি নীলা, নিজামের কন্যা নীলা! সমস্ত মিলেমিশে নীলমাধবের কাছে একটা কেমন যেন রহস্যাবৃত কাহিনী বলে মনে হতে লাগল। সে ইচ্ছা প্রকাশ করবার নয়—চরিতার্থ করা দূরে থাক। দুধের মত সাদা ও পবিত্র একটি শাড়ী ও ব্লাউজে নীলাকে যেন আরও রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল নীলুর কাছে। এমন পবিত্র বেশে নিজামের কন্যাকে নীলু আশা করেনি, চিন্তাও করতে পারেনা কখনও। বর্ষার মেঘের মত কালো একরাশ চুলকে একটা পুষ্ট বেণী করে নীলা ঝুলিয়ে দিয়েছে তার পিঠের উপর। বর্ষার মেঘ যেন নেমে এসেছে বর্ষার নদীর উপর।

"শুনলাম আপনি বাজারের খাবার খান না। কিন্তু আমার—আমাদের হাতের খাবার খাবেন তো আপনি?"

"এ-সব আব্বাসের বুদ্ধি! যা হয় কিছু খাওয়াও আমাকে—ক্ষিদেতে পেট জ্বলছে।"

"তবে আজ আহ্নিক না করেই খান—কী আর করবেন!"

"আহ্নিক না করে কোনদিন খাইনি আজও—তবে মনে মনে জপ করে নেব। তুমি গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা কর।"

"এখানে—এই বাড়ীতে জপ চলবে? কেমন বামুন আপনি—?" নীলা গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে।

"ভগবানকে ডাকতে স্থানের পবিত্রতা দরকার হয় না। নীলা—দরকার হয় মনের—"

"তবুও সংস্কার বলে জিনিস আছে তো একটা।"

"আছে। কিন্তু সংস্কার সংস্কৃতি নয়। তুমি খাবার আন—আর গরম চা।"—নীলু হেসে ফেলে শেষের দিকে। নীলা হাসতে পারল না।

"সংস্কৃতি থেকেই সংস্কার এসেছে।"

"তবে চা-ই আন। দরকার নেই খাবারের। জপ না করে আমি চা খেয়ে থাকি। আব্বাস জানে।"

"সাক্ষীর দরকার নেই। ওটাও না করা ভাল। আমি তাও করি নে।"—হঠাৎ নীলা যেন থমকে থেমে গেল। "আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন, দাদা, তোমার বন্ধুকে ওপরে নিয়ে এস—দেরী করোনা যেন।" উত্তরের অপেক্ষা না করে নীলা উপরে চলে গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত নীলু আব্বাসকে অনুসরণ করে দ্বিতলের একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখে বুঝতে পারল সেটা আব্বাসের পড়বার ও শোবার ঘর। কিছুক্ষণ পরে নীলা এসে নীলুকে ডাকল—

"আসুন, আপনার জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। মন নিয়েই যখন আপনার সব, তখন স্থান আপনাকে বাধা দেবে না—চলে আসুন আমার সঙ্গে। কই উঠুন!" নীলু নীলাকে অনুসরণ করে দ্বিতলের শেষ প্রান্তে একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল দ্বার-প্রান্তে।

"জুতো খুলে ভিতরে আসুন।" নীলার কথায় নগ্নপদে ঘরে প্রবেশ করে নীলু যে দৃশ্য দেখল তাতে তার সমস্ত শরীর যেন তুহিন শীতল হয়ে গেল,—মস্তিষ্কের ভিতরে কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। ধমনীর রক্ত চলাচল যেন বিপরীতমুখী হয়ে গেল।

ছোট্ট একটি ঘর। তার এক পাশে একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা, ঘরে আসবাবের বালাই নাই। এক কোণে একটা চৌকির উপর একটি সুন্দর আচ্ছাদন—তার উপর কতকগুলি তারের বাদ্যযন্ত্র! বড় একটি জানালার কাছে একটি নাতিবৃহৎ কাঠের আসন পাতা, তার উপর একটি রূপার সিংহাসনে সোনার গোপাল মূর্ত্তি। অপূর্ব্ব-সুন্দর গোপাল মূর্ত্তির সহাস্যবদন নীলমাধবের বিস্ময়ের পরিধি যেন আরও বাড়িয়ে দিল। এত হাসি কেন তাঁর? নীলুর মনে হল যেন তার এই পরিবেশে বিস্ময় ভাব দেখেই দর্পহারীর সেই হাসি। সে হাসি যেন নীলমাধবের চিন্তাধারাকে বিদ্রূপ করছিল। মূর্ত্তির গলায় একটি তাজা ফুলের ছোট মালা। পায়ের কাছে ফুল ছড়ান। সিংহাসনের দু'দিকে ধূপকাঠির আধারে রক্ষিত জ্বলন্ত ধূপকাঠির থেকে সুগন্ধি সমস্ত ঘরখানাকে গন্ধে ভরপুর করে রেখেছে। ধূপ, দীপ ও বিভিন্ন প্রকারের ফুলের বিচিত্র গন্ধ সুন্দর একটি আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। সে গন্ধের আবহাওয়ার স্পর্শ নীলমাধবকে যেন সম্মোহিত করে দিল। সুন্দর কাঠের আসনের রুচিসম্পন্ন কারুকার্য্য দেবতার মহিমাই বর্দ্ধিত করেছে। আসনের মস্তকের উপর মূল্যবান আচ্ছাদনটি ঠাকুরের চন্দ্রাতপরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার ঠিক মাঝখানে একটি বিলম্বিত আলো জ্বালান আছে। আলোর স্নিগ্ধ সবুজ রঙ গোপালের আসনটিকে যেন স্বর্গীয় স্বপ্নে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আসনের দু'দিকে দু'টি পিতলের পিলসুজে ঘৃতের প্রদীপ গোপালের চক্ষের দুষ্ট হাসিকে প্রকটিত করে দিচ্ছিল। এ কোথায় এসেছে নীলমাধব! এ কোথায় এসেছে গোপাল!!

"কী দেখছেন! আপনার আসন পাতা। জপ করে নিন। মুসলমানের ঠাকুর কিন্তু কোন জাতের হয় না। দেবতার জাতি নাই শুনেছি। কোষাকুষিও রেখে দিয়েছি, পাশে ওটা গঙ্গাজল। গঙ্গাজল শুনেছি ছোঁয়া যায় না। তাড়াতাড়ি করুন—ওদিকে

খাবার কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নীলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত নীলু আসনে গিয়ে বসে পড়ল। জপের মন্ত্র বের হল না, আহ্নিকের মন্ত্রোচ্চারণ হল না। নীলু শুধু তাকিয়ে থাকল গোপালের সহাস্যবদনের দিকে, এ কী অর্থহীন হাসি তাঁর? "ঠাকুর—তোমার এ হাসির অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দাও ঠাকুর!" নীলমাধব প্রণাম করে উঠে পড়ল।

"কী, হ'য়ে গেল আপনার পূজো? লোক দেখান পূজো নয়তো?" নীলা খাবারের পাত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। নীলু যেন চমকে উঠল নীলার কথা শুনে।

"লোক দেখান? লোক কোথায় ছিল যে লোক দেখান হবে?" নীলু যেন বোকার মত উত্তর দিল। সেটাকে লক্ষ্য করল নীলা।

"ওটা এমনি বললাম। আসুন, এবার খেতে বসুন। দাদা চা নিয়ে আসছে—ঐ যে, এসেই গেছে!"

নীলার কথার অর্দ্ধপথে আব্বাস নিজের হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

"তোর কই বাসু—?"

"এ ডাক আবার কবে থেকে হল?"

"আজ থেকে। আব্বাসের শুধু বাসটুকু রাখলাম। এই নামই তোর আসল বুঝলাম।"

"দেখিস বাসুদেব করে দিস না যেন!"

"তাতে ক্ষতি কী—? নামের কোন মানে হয় নাকি?" নীলার তত্ত্বাবধানে দু'জনে আহারে মন দিল। আয়োজন খুব সামান্য।

"আপনার ঘরের ব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছে গান বাজনার চর্চ্চা

আছে আপনার—একটা গান শুনিয়ে দিন না আমাকে ?” খেতে খেতে নীলু অনুরোধ জানায়।

“একটা ভজন শুনিয়ে দে নীলুকে”—আব্বাসও অনুরোধ করে নীলাকে। নীলা গিয়ে তানপুরাটা পেড়ে নেয়, বসে পড়ে ঘরের মেঝের ওপর।

“দাঁড়ান—ভজনের আগে আমাকে আর দু’খানা লুচি আর একটু হালুয়া এনে দিন—।”

“ভজনের চেয়ে ভোজনের ওপরই দৃষ্টি যে বেশী !”

“ওটা দরকার। পেটে ক্ষিধে রেখে মনের ক্ষিধে মেটে না। হ্যাঁ, দেখুন, আর দুটো সন্দেশও ঐ সঙ্গে আনবেন।” হাসতে হাসতে নীলা গিয়ে খাবার এনে দিল।

“বাবা ! এত কেন ?”

“একেবারে দিয়ে রাখলাম। ভজন করতে করতে তো আর ভোজনের ব্যবস্থা করা যাবে না।” নীলার কথায় আব্বাস যেন একটু লজ্জা পেল।

নীলা তানপুরায় তান তুলতে থাকল। তারের ঝঙ্কারে ঘরের আবহাওয়া ঝঙ্কারিত হয়ে উঠল। তরল আবহাওয়া যেন ধীরে ধীরে গভীর ও গম্ভীর হয়ে গেল। আবার যেন প্রকটিত হল ফুলের গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, পূজার আবহাওয়া। বাতাসের স্তরে স্তরে যেন নেচে উঠল গোপালের বংশীধ্বনি, শোনা গেল নূপুরের কিঙ্কিনি, দেখা গেল গোপালের হাসি। নীলার ভজন মুহূর্তে সকলকে নিয়ে গেল মীরার মন্দিরে। গানের শেষ রেশটুকুতে, শেষ মূর্চ্ছনায় যেন মীরার কাতর আহ্বান, প্রাণের প্রণিপাত ও নিঃস্বের দান পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় নীলু বিদায় নিল সে বাড়ী থেকে।

“কাকার সঙ্গে দেখা হবে না বাসু ?”

"চল নীচে, দেখি বাবা কি করছেন।"

নীচে এসে নীলু দেখল নিজাম নীচের একটা ঘরে কয়েকজন লোক সঙ্গে করে নামাজ পড়ছে। এ দৃশ্যও নীলুকে স্তম্ভিত করল।

"এখন দেখা হবে না নীলু। চল, তোকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। কাল সকালে বাবাকে বলে দেব!"

সেদিন রাত্রে নীলমাধব স্বপ্ন দেখল, যেন সে এক উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শীর্ষে এক অঞ্জলি ফুল নিয়ে কাতরভাবে চীৎকার করছে—"কস্মৈ দেবায়!"

নীলা স্বপ্ন দেখলে, যেন তার গোপাল ছোট একটি শিশু হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে, এবং স্বর্ণবলয়মণ্ডিত দু'খানা হাত দিয়ে নীলার বুকে কী যেন আকুলভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু'জনেরই অন্বেষণ দেবতার জন্য। দেবতার অন্বেষণ মানুষের! নিঃসঙ্গভাবে কেউই যেন বাঁচতে পারে না, কেউই যেন পরিপূর্ণ হয় না!

আব্বাসের বাড়ীর সঙ্গে নীলুর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। কয়েকমাস পরীক্ষা করে নিজাম নীলুকে তার পুত্রের মত—হয় তো বা পুত্রের চেয়েও বেশী স্নেহ করতে লাগলেন। নিজাম লোক চরিয়েই খায়, সুতরাং হটকারিতার স্থান নাই তার কাছে। তার বাড়ীর অন্তর্ব্যূহ ভেদ করতে দেওয়া রীতিমত পরীক্ষা সাপেক্ষ!"

"ছেলেটি খাঁটি সোনার তৈরী।"—নিজাম একদিন তার মেয়ের কোলে মাথা রেখে শিশুর মতই বলে উঠল। মতামত শুনে নীলা একটু হাসল মাত্র।

হাসলি যে বেটি! ভাবলি ডাকাত বাপ সোনাকে চিনবে কী করে? কিন্তু আমরাই সোনা চিনি রে—সাধারণ লোক চিনতে পারে না—"

"তোমরা শুনেছি সোনা চিনে কাড় না, কেড়ে নিয়ে চেন। অনেক সময় পেতলও চলে আসে হাতে!"

"সেটা তো পরীক্ষার আগে। নীলুর পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। এখন ওকে আমি তোর চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি বেটি।"

"এটা ভাল কথা নয় বাবা। তোমার বিশ্বাস দেখছি ক্ষণস্থায়ী —এটা তো তার পক্ষেও মঙ্গলের নয়!"

"না রে পাগলী—আমার বিশ্বাস হতে দেরী হয়, কিন্তু সঠিক জায়গায় হয়। আর একবার হলে তা আর যায় না। আমি তো আর ভদ্রলোক নই!"

"বাবা—এই—এ—ই ষোলটা হ'ল। এক টাকা পুরে গেল কিন্তু।" নীলা নিজামের মাথা থেকে একটা পাকাচুল টেনে তুলে ফেলল। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল।

"আচ্ছা, আজ থেকে তোকে চুলপ্রতি এক টাকা ক'রে দেব।"

"বাবা, যে ভাবে তোমার চুল পাকছে, তাতে তুমি দেউলে হ'য়ে যাবে এক টাকা ক'রে দিলে।"

"দেউলে! তোদের জন্যে আমি কবে দেউলে হ'য়ে গেছিরে নীলু—!" দস্যুর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। নীলা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন সন্ধ্যায় নীলার ঘরে নিজাম নীলুকে নিয়ে বসল। বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা। ঘরে শুধু নিজাম ও নীলু। অকস্মাৎ এই ব্যবস্থায় প্রথমে নীলু একটু সচকিত হয়ে উঠল। দস্যু-সর্দ্দারের সঙ্গে একাটি—এক ঘরে, চকিত হবারই কথা।

"শোন নীলু—তোমাকে আমি অন্ধকারে রাখতে চাই না। আমার ব্যবসার বিষয়ে নিশ্চয়ই তুমি সব কিছু শুনেছ—বাসু নিশ্চয়ই তোমাকে সব বলেছে।"

"না, বাসু কিছুই বলে নি। সে ছেলে ও নয় যে ভিতরের কথা বাইরের কাউকে বলে দেবে।"

"তুমি এখন বাইরের লোক নও। অন্ততঃপক্ষে আমি তা মনে করি না। যাক্, না বলে ভালই করেছে। আমিই বলছি আমার কথা,—আমার জীবনের কথা। এ-সব—জানে আমার ছেলে-মেয়ে—আর জানবে তুমি। তোমাকে আমি এখন বান্ধুর চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। যাচাই ক'রে দেখেছি তোমার শরীরে খাঁটি রক্ত আছে।"

"যদি আপনার আপত্তি থাকে—"

"না, শোন তা' হলে"—নিজাম নীলুর প্রতিবাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর মাটির উপর সরীসৃপের মত এগিয়ে চলল সে কাহিনী।

"পূর্ব্ববঙ্গের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে নলিনী ভট্টাচার্য্য একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল। দু'চার বিঘা খামার জমি ও দু'-চার-দশঘর যজমানই ছিল তার সম্বল। কু-দর্শন নলিনী ঠাকুরের কাল হল তার পরমা-সুন্দরী স্ত্রী। গ্রামের জমিদার দুর্দ্দান্তপ্রতাপ যামিনী ভাদুড়ীর ভয়ে একই ঘাটে বাঘে গরুতে জল খেত। সে প্রতাপ নলিনী চক্রবর্ত্তী আশৈশব অনুভব করে এসেছে। নলিনী ঠাকুরের স্ত্রীর রূপ-কাহিনী জমিদার জানতে পেরে তাকে তিনি নিজের ঠাকুর বাড়ীর পূজারী নিযুক্ত করলেন। ঠাকুর ভাবলেন—তার কপাল খুলল, ঠাকুরের ঠাকুর ভাবলেন তার কপাল পুড়ল। ভেট উপহার আসতে আরম্ভ হল ঠাকুরের বাড়ীতে, ইঙ্গিত ইসারা আসতে থাকে ধীরে ধীরে। নলিনী ঠাকুরের স্ত্রী অনিলা ত্রস্ত হয়ে ওঠে মনে মনে, স্বামীকে সে-কথা জানাবার সাহসও হয় না তার। প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে একদিন জমিদারের বরকন্দাজরা অনিলাকে অমাবস্যার গভীর রাত্রে এনে উপস্থিত করে জমিদারের বাগানবাড়ীতে। সেদিন নলিনী ঠাকুর সদরে মহাকাল কালীর কাছে জমিদারের মানত পূজার আয়োজন করতে গিয়েছিলেন। পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হ'ল

সে কথা। শুনতে পেলেন নলিনী ঠাকুর। দেখলেন উন্মাদিনী দৃষ্টির অনিলাকে। স্ত্রীর মুখে একটিও শব্দ নাই, বাক্যহারা অনিলার মুখে কে যেন কালির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে। গ্রাম তাকে ক্ষমা করল না। দ্বারে দ্বারে নলিনী ঠাকুর প্রতীকারের জন্য পথের সন্ধানে ধর্ণা দিলেন। সকলে তাকে স্ত্রী-ত্যাগের উপদেশ দিল। কুলটা স্ত্রীকে গ্রামে রাখা চলবে না। নলিনী ঠাকুর কুলত্যাগ করলেন—কুলটাকে ত্যাগ করলেন না। কুলটা স্ত্রী ও তু'বৎসরের শিশু পুত্র বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে সহায় ও সম্বলহীন অবস্থায় নলিনী ঠাকুর কলকাতার বুকে এসে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ধর্মরক্ষার জন্য তিনি হিন্দুর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিলেন। লক্ষ্য সকলের অনিলার দিকে—তাদের অবস্থার দিকে নয়। সর্ব্বত্রই যেন জমিদারেরই প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। পথের শেষ প্রান্তে এসে যেন দেখা দিলেন ভগবান—যার জাতি নাই, বর্ণ নাই। এক মুসলমান তাকে আশ্রয় দিল, অভয় দিল তাকে, নিজের বোনের মত গ্রহণ করল অনিলাকে। মুসলমানটি মহানগরীর বিখ্যাত এক দস্যু-সম্প্রদায়ের সর্দ্দার। নলিনী দীক্ষা নিলেন তার কাছে, দস্যুর খাতায় নাম লেখালেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। অনিলা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করতে স্বীকার করল না, সে জানাল যে, যার জাত গিয়েছে তার ধর্ম্ম নাই, সুতরাং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ অর্থহীন হয়। নলিনী ঠাকুর জোর করেন নি কারণ তার সর্দ্দারের সে-রকম কোন নির্দ্দেশ ছিল না। স্বামী-পুত্র তু'জনেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে হিন্দুর সমাজের হাত থেকে রক্ষা পেল,—একটা আশ্রয় পেল। অনিলা তার ধর্ম্মপিতা নিজামের সর্দ্দারের আশ্রয়ে জাতিহীন ও বর্ণহীন হয়ে থেকে গেল। নিজাম শান্তি ও স্থিতির মুখ দেখল। কিছুদিন পরে অনিলা নীলাকে পৃথিবীর আলো দেখাবার সময় নিজের আলো নিভিয়ে দিল।

"বাবা, মেয়েটাকে হিন্দু ক'রে মানুষ করো। আমি তোমাদের সমাজে জাত রাখতে পারি নি—ও হিন্দু থাকলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"—অনিলা তার এই শেষ অনুরোধ জানায় তার ধর্ম্ম-পিতা নিজামের সর্দ্দারকে। মিনতি জানায় তার স্বামীকে নিজের পাংশু চোখের দৃষ্টি দিয়ে। অনুরোধ দু'জনেই রেখেছিল। সেই থেকে অনিলার কন্যা হল নীলা,—অথচ নলিনী হয়ে গেছে নিজাম আর তার ছেলে বাসুদেব হয়ে গেছে আব্বাস।"

কাহিনী শেষ করে নিজাম জানালা দিয়ে বাহিরের অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকাল। নীলু তাকাল নীলার গোপালের দিকে। সে মুখে হাসি, বাহিরের পৃথিবীতে অন্ধকার।

"অনিলা শেষ পর্য্যন্ত তার গৃহ-দেবতা গোপালকে ছাড়েনি। নীলু, তার জাত তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু গোপাল তাকে ছাড়ে নি। সেই গোপালকেই সোনা দিয়ে মুড়ে এখন নীলা পূজা করে। সোনার স্পর্শে পিতলের গোপালও হয়ত সোনার হয়ে গেছে—কিন্তু আমার বুকটাকে লোহা দিয়ে মুড়েছি তাই ভিতরটাও লোহার হয়ে গেছে।" নিজাম তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দিল, এক ঝলক শীতল হাওয়া বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে বাঁচাল নিজামকে।

"এ কি মা! তুই এখানে দাঁড়িয়ে যে! সব শুনছিলি নাকি?"

"হ্যাঁ বাবা। কিন্তু তুমি সব বলে দিয়ে কি ভাল কাজ করলে? এ ঘটনা যে আমি আর দাদা ছাড়া আর কেউ জানে না।" নীলা নীলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, সে মুখে তখন অর্থহীন দৃষ্টি!

"হ্যাঁ মা, পৃথিবীতে আর একজন জানল। তাকে আজ আমি তোদের মতই বিশ্বাস করি।"

"যদি সে অবিশ্বাসের কাজ করে—?"

"তা হলে—পরের দিনের আলো তাকে আর দেখতে হবে না। না না, নীলু এ কাজ করতে পারে না।"

নিজামের কথা শুনে চমকে উঠল নীলু, চমকে উঠল নীলা। নিজাম দ্রুত বেগে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল।

"আপনি এ কাহিনী কেন শুনতে গেলেন ? শুনলেন তো বাবার শেষের কথা—" শেষের কথাতেই নীলা বেশী ভীতা।

"আমি শুনতে চাইনি। উনিই জোর করে শোনালেন। তোমার চেয়ে আমার প্রাণের উপর আমার বেশী মায়া নীলা। যাক—এবার একটু চা খাওয়াও দেখি—গলা শুকিয়ে গেছে।"

"কেন, ভয়ে ?"

"না, ভয়ে নয়। ভাবনায়! বাসু কোথায় ?"

"দাদার ঘরে। ডেকে দিচ্ছি।"

নীলা বের হ'য়ে যাবার পর নীলু আবার গোপালের দিকে তাকাল। সেই হাসি!

নিজামের কাহিনী নীলুকে দুর্ব্বল করতে পারে নাই, দুর্ব্বল করেছিল নীলাকে। নীলা জানে সে কাহিনী কত গভীর, কত গম্ভীর। সে জানে তার গোপনতাকে রক্ষা করতে না পারার কী বিষময় ফল। তারপর কয়েকদিন সে নীলুকে শুধু সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। ত্রস্তা হয়েছে সে পিতার সতর্কবাণী স্মরণ করে।

"তোমার কোন ভয় নেই নীলা। আমার প্রাণের মায়ায় নয়, তোমার ও বাসুর জন্যই এ কাহিনী আমার কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রাণী জানতে পারবে না। বাসু আমাকে নিজের চেয়েও বিশ্বাস করেছে, তার বিশ্বাসকে—

"আর আমি!—আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করিনি—?"

"না-ও বলতে পারিনে, হাঁ-ও বলতে পারিনে। কারণ তার যাচাই এখনো হয় নি। সে যাচাই একদিন হয়েও যাবে।"

"এতদিনেও যাচাই হয় নি—তবে তো খুব বুদ্ধি আপনার।"

"সোনাকে আমি হাতে করে যাচাই করিনে—করা যায়ও না।

"তাহলে আমি সোনাই বলুন—খালি তার খাদটা যাচাই করতে বাকি আছে।"

"না ঘষলে বলতে পারিনে। চক্‌চকে পিতলও হতে পারে।" দু'জনেই হেসে ওঠে, হাওয়া হাল্কা হয়।

কালের চক্র মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে নাই সৃষ্টির আদি থেকে। সুতরাং আজও সে তার ধর্ম্ম পালন করে গেল। নীলু ও আব্বাস দু'জনেই বি. এস. সি পাশ করল। মাহ্‌মুদ পাশ করল বি. এ। পিতার বার্দ্ধক্য মাহ্‌মুদকে আর পড়বার অনুমতি দিল না, —সে গিয়ে গ্রামে বসল পিতার সম্পত্তি দেখবার জন্য। কালে কালে জমিদারের জমিদারী কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত ক্ষয়িষ্ণু হয় কিন্তু তার আমলার ও মামলার আয়তন বাড়ে। তাফু মিঞা যাদব চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাসী আমলা এবং প্রকৃত বন্ধু, তবুও তার সম্পত্তির যা আয়তন হয়েছিল তার দৌলতে মাহ্‌মুদ কিছু না করেও দাড়িতে আতর লাগিয়ে ফরাশে বসে থাকতে পারত। কিন্তু তাফু মিঞার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে জমিদারি সেরেস্তায় বসাবার। বাধা দিলেন জমিদার।

"ওকে আর ও ঘানিতে জুড়ে দেবেন না কাকাবাবু। এত কষ্ট করে লেখাপড়া শেখালেন—"

"কোথায় আর দেব বলুন। চাকরীর যা বাজার।"

যাদব চক্রবর্ত্তী বহু কষ্টে, বহু অর্থব্যয় করে নিজের গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সরকারের দৃষ্টি-কৃপায় ও অর্থ-সাহায্যে সেটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হচ্ছিল। জমিদার মাহ্‌মুদকে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক করে দিলেন। তাফু মিঞা হাতে আকাশের চাঁদ

পেল। ঘরে বসে চাকরি ও সম্পত্তি তদারকের এমন একটা বুদ্ধি তার পাকা মাথাতেও খেলে নাই।

নীলু ও আব্বাস এম. এস. সি-তে ভর্ত্তি হয়ে গেল। নীলার গোপালের সিংহাসন রূপা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। এটা গোপালকে পুরস্কার দিল নীলু। ভাষাহীন ভাষাগুরু গোপাল! প্রাণহীন প্রাণময় গোপাল!

যথাসময়ে নীলু সর্ব্বোচ্চ স্থান নিয়ে এম. এস. সি পাশ করল। আব্বাসও প্রথম বিভাগে কৃতকার্য্য হল। পাশ করবার পর নীলু বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রিয় বিষয়ের গবেষণা করতে আরম্ভ করল। আব্বাস কলিকাতার একটি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করল। পরীক্ষার যেদিন ফল বের হয়, সেদিন নিজাম আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কেঁদে ফেলল, সে দৃশ্য দেখে নীলার চোখে অশ্রু-বন্যা, নীলুর চোখ ছলছল। নিজাম—মহানগরীর ত্রাস দস্যু-সর্দ্দার নিজাম যেন ফিরে এল তার পূর্ব্বজন্মের নলিনী ঠাকুরের স্মৃতিতে। অনিলার স্মৃতি আবার তার পাষাণ-কঠিন অন্তরের নীচের স্তরকে আঘাত করল। নিজামের মনে পড়ে গেল বহুদিনের সেই ছবি। যেদিন সে শিশু-পুত্র বাসুদেবকে বুকে করে ও অনিলার হাত ধরে গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করে, ত্যাগ করে তার পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটা, ত্যাগ করে তার জন্মভূমি—যেখানে সে আশ্রয়হীন সহায়হীন ও জাতিচ্যুত হয়ে গেল। তার বুকে বাসুদেব, অনিলার বুকে গৃহদেবতা গোপাল। সেদিনের দিন ও আজকার দিন। প্রায়-মূর্খ নিজাম আব্বাসের গালের উপর হাত বুলাতে লাগল আর তার চোখের তারায়, এবং চোখের জলে অন্বেষণ করতে লাগল অনিলার প্রতিচ্ছবি! সেদিন নীচের তলায় নিজামের অনুচরদের আনন্দের সমারোহ, উপরে নীলু, নীলা ও আব্বাসের করুণ আনন্দোৎসব!

"এবার তুমি আমার গোপালকে কী দেবে?"—গোপালের ভোগ সাজাতে সাজাতে নীলা নীলুকে প্রশ্ন করল।

"কিছু না—এবার তোমার গোপালের শুধু দেবার পালা!"

"কেন?"—নীলা না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

"কারণ এবার আমি বেকার হলাম। বেকারকে এবার মহা-বেকার গোপাল খাওয়াবে!"

"আমার গোপাল বেকার!"

"বেকার নয়—মহা-বেকার! জীবন ভর যে বসে বসে খায় সে কী?

"বেশ, আমার গোপাল মহা-বেকারই! মহা-বেকার আবার তোমাকে কী দেবে?" নীলার কণ্ঠস্বর যেন অভিমানে ভরা! নীলা গোপালের গলায় মালা পরাতে পরাতে উত্তর দিল।

"গোপালের দেবার শক্তি না থাকে তার দাসী দিক এবার। এমন কৃপণ দাসীও দেখিনি কখনো।

নীলুর কথা শুনে নীলা চমকে উঠল, ক্ষণিকের জন্য তাকাল নীলুর দিকে। এ কী প্রশ্ন! এই দীর্ঘদিনের পরিচয়ে নীলু তাকে কখনো এমন প্রশ্ন করে নাই। নীলা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তার মত নিঃস্বারও দেবার মত শক্তি আছে। তার কাছে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দেবার মত নিঃস্বও এ পৃথিবীতে আছে। ভিখারিণীর কাছে এ যে রাজার ভিক্ষা চাওয়া।

"নীলা! আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমার এই বাচালতা, এই স্পর্দ্ধাকে তুমি ক্ষমা কর নীলা। তোমাকে আঘাত দেবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত!"

নীলুর কথার উত্তর দেবার শক্তি নীলা তখন হারিয়েছে। সে তাকিয়ে থাকল গোপালের মুখের দিকে—সে মুখে কী অপূর্ব্ব হাসি! নীলার সমস্ত রক্তপ্রবাহ আজ প্রথম যেন জাগরিত হল,

প্রথম যেন জন্ম হ'ল নীলার। নীলা ধীরে ধীরে গোপালের গলার মালাটি খুলে নিল, অচঞ্চল ধীর পদক্ষেপে এসে সেটিকে পরিয়ে দিল নীলুর গলায়, গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল নীলুকে।

"এ তুমি কী করলে নীলা!"

"ঠিকই করলাম। আমার গোপালের আদেশ। এর বেশী আমার—গোপালের দাসীর আর কিছু নেই। আমার আর কিছুই ছিল না। এতদিন সবটুকু তোমার জন্য—আমার গোপালের জন্যই জমিয়ে রেখেছিলাম। দিতে দেরী হ'লে হয় তো সব চুরি হয়ে যেত—" নীলা একটি ঝর্ণার মত ভেঙ্গে পড়ল নীলুর বুকে। নির্ঝরের প্রথম স্বপ্ন-ভঙ্গ!

"দাদা আসছে!" নীলা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চোখের জল মুছে নিল এবং নীলু গলার মালাটা খুলে পকেটে পুরল।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"—আব্বাসকে প্রশ্ন ক'রল নীলু।

"নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। তোর মত কাফের হব?" আব্বাস হেসে উত্তর দিল।

"তোর তো সহজে হয়ে গেল। এদিকে কাফের যে সফেদ হবার উপক্রম হয়েছে। ক্ষিদেয় প্রাণ যায় অথচ ভোগ না হ'লে নাকি খাওয়ার উপায় নাই। শুধু তাকিয়ে বসে আছি।"

"পেটুক বামুন। আজ আমার গোপালের পেট ফুলবে ঠিক!" নীলা হেসে ফেলে।

"তা ফুলুক। একটু তাড়াতাড়ি করো।"

নীলুর কথায় নীলা গোপালের ভোগ নিবেদন করে দিল। আজকার নিবেদন নীলার কাছে যেন চরম-সার্থক নিবেদন বলে মনে হ'ল। তৃপ্তির নিবেদন, পরম তৃপ্তির গ্রহণ।

আব্বাসের চাকুরী গ্রহণের পর নিজাম তার পূর্ব্ব ব্যবসা থেকে

অবসর গ্রহণ করল। ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে সাধু হবার মত মনোবৃত্তি নিজামের ছিল না, সেভাবে সে মনকে ও পৃথিবীকে ঠকাতে চায়। নিজের স্বাস্থ্য ও বার্দ্ধক্যের অজুহাত দেখিয়ে সে তার অনুচরদের কাছে অবসর ভিক্ষা করল। কয়েক দিন গুপ্ত বৈঠকের পর সর্দ্দারের অনুরোধ অনুচরেরা সখেদে গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিল। দলের ভার পড়ল নিজামের প্রিয় উপ-সর্দারের উপর। বাহিরের কাহিনী এই। বাহিরের আবরণই অনুচররা দেখল, ভিতরের কাহিনী তাদের অজ্ঞাত থেকে গেল।

"বাবা, দাদা কলেজে পড়াবে। এবার আমাদের বাড়ীটা বদলাও না—কোন এক—" নীলা বাকিটা বলবার সাহস পেলনা। নিজাম তার কথার, তার অনুরোধের নিহিত অর্থ বুঝতে পারল। দীর্ঘ এই জীবনে এ প্রস্তাব দেবার সাহস কোন দিন নীলাও পায়নি। নিজাম বুঝতে পারল যে, তার রথ পশ্চাতে অনেকখানি পথ ফেলে এসেছে। বুঝতে পারল যে, এখন তার রথের চাকায় ক্লান্তির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। খেয়ালী নিজাম নীলার প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করল।

নিজামের অবসর গ্রহণের পরে নীলারা পার্কসার্কাস অঞ্চলে একটি ছোট সুন্দর বাড়ীতে উঠে গেল। নীলু রাজাবাজারে একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিল, সঙ্গে তার কলকাতার চাকর ও বন্ধু উৎকলবাসী পদ্মনাভ। নীলু তাকে ডাকতো নাভি বলে—আদরের ডাক, বিশ্বাসের ডাক। নীলা ও নীলুর বাহিরের দূরত্ব বাড়ল কিন্তু অন্তরের আকর্ষণও সেই সঙ্গে তীব্র হ'ল।

দিনের চাকা ঘুরে গেল, যেমন ঘুরে যাচ্ছে সৃষ্টির আদি কাল থেকে। ভৌগোলিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর একই অংশে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আসে কিন্তু মানুষের জীবনে আলো ও অন্ধকারের গমনাগমন এমন স্থিরীকৃত পদ্ধতিতে

হয় না। মানুষের জীবনে কখনো কখনো মেরু প্রদেশের মত দীর্ঘ রাত্রিই থেকে যায়। পাশ করবার পর নীলু ও আব্বাস তাদের জীবনের নূতন পথের যাত্রী হল। পথ ভিন্ন কিন্তু পাশাপাশি ও একই নির্দ্দিষ্টমুখী। পথ পরিষ্কার কিন্তু বন্ধুর।

কোন এক বিস্মৃতপ্রায় অপরাহ্নে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত যায়। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে অসংখ্য পলাশ ফুলের বুকে অস্তগামী সূর্য্যের করুণ আলোর রঙিন প্রতিচ্ছবি। কুসুমাস্তীর্ণ রক্তিম প্রান্তরের বুকের উপর বাংলার রক্ত প্রবাহিত হল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য, সে রক্তস্রোত রোধ করতে পারল না বিভীষণের কালো রক্তস্রোতকে। পারল না অপবিত্রতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। ক্লেদ জয় লাভ করল সাময়িকভাবে কৃষ্টিকে পরাজিত করে। সে কথা বাংলা ভুলতে পারে নাই, তাই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সে প্রদীপে ধীরে ধীরে তেল জুগিয়ে এসেছে। পলাশীর প্রান্তরের কাহিনীকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলবার জন্য বাংলার আকাশে বাতাসে আবাহন মন্ত্র ধ্বনিত হয়। তিলে তিলে বাংলা তার রক্তক্ষয় করেছে, পাংশু ও পাণ্ডুর হয়ে এসেছে তার মুখচ্ছবি, কিন্তু তবু সে আশা হারায় নাই, উদ্দীপনার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সমস্ত বাংলা তখনও পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে নবীন অরুণোদয়ের জন্য তাকিয়ে ছিল। যে জিনিস সে একদিন হারিয়েছে, সে জিনিস সে-ই এনে দেবে এই আশায়।

তেমনি একটা অপরাহ্ন। কলকাতার শান্ত বুকের উপর অকস্মাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, থমথমে হয়ে উঠল সমস্ত আকাশ, সচকিত হয়ে উঠল সমস্ত ধরাতল। বিদ্যুত-চকিতে মহা নগরীতে কালো ঝড় উঠে পড়ল। সতর্ক হতে হতে সহরের এক প্রান্ত থেকে

অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার পড়ে গেল। হলাহলের স্রোত খুলে গেল পথে পথে, গলিতে গলিতে।

দাবানল জ্বলে উঠল দিকে দিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে মহানগরীর রাজপথে বহে গেল রক্তস্রোত। অপসৃয়মান জনস্রোত বাধা পেল রাজপথের মৃতদেহের আবর্জ্জনায়। বাংলার আকাশে বাতাসে আবার পলাশী প্রান্তরের মর্ম্মন্তুদ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হল। যে বিদ্বেষের বীজ শতাব্দী পূর্ব্বে পলাশীতে বপন করা হয়েছিল, সে বীজ বাংলার বুকে মহীরুহ-রূপে দেখা দিল। যে বিষ পান করে বাংলা সেদিন নীলকণ্ঠ হয়েছিল সেই বিষ আজ তাকে অধঃ করবার জন্য টুঁটি চেপে ধরা হল! রাবণ অমর নয় কিন্তু বিভীষণ অমর। ইংরাজ ঘরে আগুন ধরায় নাই, ইংরাজ ঘরে ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেয়। ইংরাজ যোগ জানে না, সে শুধু ভাগ জানে। ভারত-বাসীর জামায় আগে পকেট ছিল না, ইংরাজ তাকে পকেট শেখাল। পকেট করা ইংরাজের বিশেষত্ব, জামার আষ্টেপৃষ্ঠে পকেট তাদের জাতীয় সম্পত্তি। গুপ্তপকেট আমরা তাদের কাছেই শিখি। মহানগরীতে পকেট ও অন্তর্পকেটের সৃষ্টি হ'ল।

সেদিন সকালে নিজামের বাসায় সকলে উদ্বিগ্ন হল নীলুর জন্য। নীলার ভাষা শুষ্ক হয়ে তখন কণ্ঠে বাষ্পের রূপ ধারণ করেছে। দৃষ্টির ভাষা দিয়ে সে একবার পিতা ও একবার ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাল।

"রাজাবাজার থেকে নীলুকে সরিয়ে আনতে হবে বাবা—ওখানে থাকলে ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না"—আব্বাস নিজামকে জানালে।

অনুমোদনের শক্তি ছিল না নীলার, সে শুধু আত্মহারা মিনতি প্রকাশ করল দৃষ্টির ভাষা দিয়ে।

"তোরা চিন্তা করছিস কেন, আমি এক্ষুনি গিয়ে তাকে এখানে

নিয়ে আসছি—শহর শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে ছাড়ব মনে করেছিস ? আব্বাস, তুমি গিয়ে কাশেমকে তার ট্যাক্সিটা আনতে বল, আমি এখনি যাব।"

"আমিও যাব বাবা—আমি না গেলে সে হয়তো আসবে না—যা জিদি লোক—বড় জিদি বাবা!"

"এই অবস্থায় তুই কোথায় যাবি মা ? এই কি যাবার সময় ?"

"তোমার পায়ে পড়ি বাবা। তোমরা তাকে কেউ আনতে পারবে না, বড় জিদি লোক—আর একদিনও যদি সে সেখানে থাকে—"

নীলা শিশুর মত কেঁদে উঠল। লুটিয়ে পড়ল আব্বাসের বুকে। নীলুর জন্য প্রথম তার ধরা পড়া পিতার কাছে। আব্বাস ধীরে ধীরে নীলার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আব্বাসের প্রথম আবিষ্কার, নীলার প্রথম পরাজয়। তিন জনে গিয়ে উপস্থিত হল নীলুর বাসায়। নিঝুম নিশ্চুপ মহল, মাঝে মাঝে চীৎকারে ফেটে উঠছে তার আকাশ। চীৎকারের উল্লাসের বুকে ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠছে একটি আর্ত্তনাদ। নীচে ট্যাক্সিতে নিজাম বসে থাকল, নীলা ও আব্বাস উঠে গেল নীলুর ফ্ল্যাটে।

"কী ব্যাপার—তোমরা এ সময় ? এলে কী করে এর মধ্যে ? শিয়ালদ'র মোড় পার হলে কী করে ? খুব অন্যায় করেছ বাসু এই বিপদের মুখে বের হয়ে।" নীলু ঝড়ের মত বলে গেল।

"নীলু তৈরী হয়ে নে। এক্ষুণি যেতে হবে তোকে আমাদের সঙ্গে। নীচে বাবা গাড়ীতে বসে আছেন।"

"যেতে হবে ? কোথায় ?"

"আমাদের বাসায়। এখানে তোর থাকা হবে না।"

"তোর বাসায় ? সেই পার্ক সার্কাসে ? তুই পাগল হলি বাসু ? এ যে তপ্ত কড়াই থেকে আগুনে আশ্রয় নেওয়া হবে। তোরা

ফিরে যা বাম্নু, ঐ শোন—" আবার একটা উল্লাস করুণ আর্ত্তনাদে পরিসমাপ্ত হল।

"তুমি যাবে না? ফিরিয়ে দেবে আমাদের? সকলকে ফেরাতে পারবে—আমাকে পারবে না তুমি।"—নীলার কণ্ঠস্বর যেন পাগলের কণ্ঠস্বর।

"ছেলেমানুষী করো না নীলা।"

"তোমার রহস্য শুনতে আসিনি। শিগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও, নীচে বাবা বসে আছেন, রাস্তায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। ওগো তোমার পায়ে পড়ি—" নীলা নিজেকে লুটিয়ে দিলে নীলুর পায়ে। এতদিনের গোপন কথা আজ সকলের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো আত্মসমর্পণের জন্য।

"আচ্ছা চল। কিন্তু আমার নাভি। কাল থেকে সে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমাকে রক্ষা করেছে। তাকে কোথাও রেখে যেতে পারব না।

"কে তাকে রেখে যেতে বলছে। যে তোকে বাঁচায় তাকে আমি তোর থেকে আলাদা ভাবি না নীলু। নাভি!—" নাভি এসে দর্শন দিল।

"নাভি! তৈরী হয়ে নে। এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—।" আব্বাসের সঙ্গে এই সময় যেতে হবে শুনে নাভি যেন চমকে উঠল।

"মুই—?"

"হ্যাঁ—তুই না তো কি মুই? যা চট করে সব দরজায় তালা দিয়ে আয়, একটা জামা পরে নে। জিনিস সঙ্গে নিতে হবে না কিছু।"

"আর দাদাবাবু?"

"তোর দাদাবাবু থাকবে এখানে।"

"মুই যাব নি—যান আপনারা। আমার প্রাণের দাম অত বেশী নয় বাবু—?"

"না রে পাগল, তোর দাদাবাবু ও যাচ্ছে। শিগ্‌গির কর নাভি, আর দেরী করিসনে। তোদের পায়ে পড়ি।"—নীলার কথায় নাভি হাতজোড় করে ফেলল।

ছিঃ ছিঃ! দিদিমণি, মোর পাপ হইল। সদর দরজায় একটা তালা দিয়ে সকলে এসে মোটরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এসে মটরকে ঘিরে ফেলল।

"সর্দ্দার! আদাব।" দলের দলপতি নিজামকে অভিবাদন জানাল। "আপনি এখানে—"

"আমার এই ত্বু'জন নিজের লোককে আমি নিতে এসেছি ভাই! পার্ক সার্কাসে নিয়ে যাব!"

"কিন্তু শেয়ালদ' পার হয়ে নিয়ে যাওয়া খতরনাক হবে সর্দ্দার! আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কোন দরকার নেই ভাই! শেয়ালদ'র মোড়ে লোক আছে। আচ্ছা, চলি ভাই—চল কাশেম!"

রাজাবাজার থেকে শিয়ালদহের দূরত্ব বেশী নয়। ফেরার পথে দেখা গেল পথের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মাথার উপরে দড়ি দিয়ে মৃতদেহ টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। শিশুর ও নারীর উলঙ্গ মৃতদেহ বিলম্বিত গাছের ডালে। পথের বুকে পশুর মৃতদেহের মত ছড়িয়ে আছে মানুষের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। নীলা ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিল। বহুবাজারের মোড়ে একদল উত্তেজিত জনতাকে দেখা গেল। তাদের বিশ্রী চীৎকারে আকাশে কাকের দলও উড়তে উড়তে চমকে উঠছে।

"কাশেম, হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট আর ওয়েলেসলি দিয়ে বেরিয়ে যাও—মোড়টার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।" নিজামও

যেন একটু ভীত হয়ে উঠল। জোরে চালাও—খুব জোরে। গাড়ী তীব্রবেগে মোড় নিল। জনমানব শূন্য কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পার হয়ে গাড়ী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পৌঁছল, তখন তার গতি শুধু মন্থর হল না, স্থির হয়ে গেল। একদল যুবক গাড়ীকে ঘিরে ধরল। গাড়ী-চালক কাশেমের দাড়িই কাল হল সে যাত্রার।

"আরে নীলু-দা!—ওরে নীলুদা, সঙ্গে বৌদি। এদেরকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল এরা—বলে জয় মহাবীর জী কি জয়—

মুহূর্তে কী যেন হয়ে গেল। কথার সময় দিল না, যুক্তির যোগ্যতা দিল না, পরিচয়ের সুযোগও দিল না। চোখের নিমেষে রাজপথে লুটিয়ে পড়ল নিজাম, আব্বাস, নাভি ও কাশেমের মৃতদেহ। অগ্নি সংযোগে গাড়ীর লেলিহান শিখা উপরের বাতাসকে কাঁপিয়ে দিল। পালাতে গিয়ে আব্বাসের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত হয়ে লুটিয়ে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপান শ্রেণীর পাদদেশে। বিদ্যার্থীর শেষ পূজা বিশ্ববিদ্যালয়কে।

"নীলুদা আর বৌদিকে সরিয়ে নে। আগুন—আগুন! আগুনে পুড়বে ওরা।" দু'জনকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল ফুটপাথের উপর, ঘিরে থাকল কয়েকজন। নীলু নীলাকে জড়িয়ে ধরে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। নীলা ভাষাহীন দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে নীলুর মুখের দিকে। দৃষ্টির সম্মুখে যেন অনন্ত সমুদ্রের স্থির নীল জলরাশি। "মিলিটারি—মিলিটারি—" মুহূর্তের মধ্যে যুবকের দল মিশে গেল আশপাশের গলিতে—আত্মগোপন করল বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে। সৈন্যবাহিনীর গাড়ী এসে নীলা ও নীলুকে তুলে নিল নিরাপদ স্থানে জমা দেবার জন্য। "খট্‌মট্‌"—নীলু বেশ অনুভব করতে পারল যে গাড়ীটি নিজাম ও নাভির মৃতদেহের উপর দিয়ে চলে গেল। উঃ! চীৎকার করে উঠল

নীলু। নীলা তখনও হতবাক, হতবুদ্ধি মর্ম্মর মূর্ত্তির মত নীলুকে জড়িয়ে বসে আছে।

পশ্চাতে এম্বুলেন্স এসে মৃতদেহগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে ঢেলে দিল। বিকৃত মৃতদেহের স্তূপ হয়ে উঠেছে সেবা-সদনে। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত রক্ত প্রবাহ জমে উঠেছে প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে। মৃত্যু সকলকে একত্রিত করেছে, সকলকে এক করেছে,—মুছে দিয়েছে জাতি ও ধর্ম্মকে একই বর্ণের রক্তের প্রলেপে। জীবনে যা পারে নাই, মৃত্যুতে তাই পেরেছে—মৃতদেহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কণ্ঠলগ্ন হয়েছে। এক সুন্দর বীভৎস দৃশ্য!

কয়েকদিন ধরে মহানগরীতে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলার পর, গৃহদাহ, লুট ও হত্যার এক পরিব্যাপ্ত অধ্যায় রচনার শেষে আবহাওয়া কিছু শান্ত হল। শান্তি আনবার চেষ্টায় শান্তি আসে নাই, শান্তি এল ক্লান্তিতে,—শান্তি এল পূর্ণ তৃপ্তিতে। শেষ অধ্যায়ে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি পরিদর্শনে আসেন—আসেন শান্তি স্থাপনের অছিলায়। ইংরাজ সব যুদ্ধক্ষেত্রে শেষেই আসে, সে যুদ্ধ লড়ে না, সে "টোটাল-ওয়ার" লড়ে।

মহানগরীতে শান্তভাব ফিরে এল, কিন্তু শান্তি ফিরে এল না সেখানে,—শান্তি ফিরে এল না বাংলাদেশে। কয়েকদিন বিভীষিকা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়ে দেবার পর নীলু যখন আত্মস্থ হল, তখন সে দেখল যে, সাহায্য-কেন্দ্রের স্তূপীকৃত হতবাক নরনারীর স্তূপের মধ্যে সে ও নীলা পড়ে আছে। শান্ত হয়েছে সকলের আর্ত্তনাদ ক্লান্তিতে, ক্রন্দনের ভাষা রুদ্ধ হয়েছে শ্রান্তিতে। সকলে যেন এক নতুন পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছে। ফিরে যাবার তাড়া নাই কোন দেহে, সাড়া নাই কোন প্রাণে। ফিরে অথচ যেতেই হবে, কারণ ফিরিয়ে দেবার, তাড়িয়ে দেবার সাড়া পড়ে গেছে।

"নীলা, চল এবার আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

"ফিরে যাব? কোথায় ফিরে যাব? বাড়ী? বাড়ী কোথায় নীলু—?"

নীলা নিজেকে যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দিল নীলুর বুকে। সে দৃশ্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করল না, আকর্ষণ করবার মত দৃষ্টি তখন কারো ছিল না।

"কোথায় যাবে তুমি?"

"জানি না। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে। যেখানে তুমি যাবে। যদি সঙ্গে না নিতে চাও, ছেড়ে দাও আমাকে কলকাতার পথে। কলকাতায় লোক মরে, কিন্তু না খেয়ে মরে না শুনেছি।

"পথে কেন নীলা! আমার যদি জায়গা হয় তোমারও হবে। কিন্তু একবার তোমার বাসাটা দেখে আসবে না?

"আমার বাসা? সে পাখীর বাসায় এই ঝড়ের পরে গিয়ে আর কী হবে নীলু। না, না—সেখানে আমি আর যাব না।" নীলা আবার শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠল। "সেখানে আমাকে যেতে বল না নীলু। কী জন্যে যাব? কার জন্যে যাব?"

"তোমার গোপাল!"

"আমার গোপাল? না, তার জন্যেও নয়। সকলেই যখন আমাকে ছেড়ে গেল তখন আমিও গোপালকে ছেড়ে দিলাম। সে যখন আমাকে আশ্রয় দিল না, তখন আমিও তাকে আশ্রয় দেব না। সে নিজের আশ্রয় নিজেই খুঁজে নিক—আমি আর পারব না—তাকে সামলাতে আর পারবনা নীলু।"

পাখীর মত বাসাকে ত্যাগ করে দু'জনে পরদিন শিয়ালদহে যশোরগামী একখানা ট্রেনে চেপে বসল। নীলুর পুরাতন পথ, নির্দ্দিষ্টের দিকে গতি। নীলার নূতন পথ, অনির্দ্দিষ্টের দিকে যাত্রা। সর্ব্বহারা যাত্রীর দল বুকে করে গাড়ী ছেড়ে দিল।

"আমরা কোথায় চলেছি নীলু ?"

"আমার—তোমার নতুন বাড়ীতে নীলা।"

"ওঃ"—অর্থহীন উত্তর দিল নীলা। যে বিষ সেদিন বাংলার মাথায় পড়েছিল সে বিষ গড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্ব্বাঙ্গ বহে নীচের দিকে। সে বিষ ছড়িয়ে পড়ে সর্ব্বত্র, এ বিষ যায় বঙ্গোপসাগরের বুকের দিকে, বিষ গিয়ে মিশে যায় রত্নাকরের বুকে, লবণাক্ত রক্তপ্রবাহ গিয়ে মিশে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সাগরের লবণাক্ত বুকে। সে প্রবাহের চিহ্ন এখন নাই কিন্তু তার দাগ এখনও আছে,—তার স্বাদ এখনও বাংলাব কণ্ঠে বিদ্যমান। মহানগরীর আগুন বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে প'ড়ে ভস্মীভূত করে দেয় সোনার বাংলাকে।

সন্ধ্যার সময় দু'জনে ঝিনাইদহে গিয়া পৌঁছল। সহরের থমথমে ভাব দেখে নীলুর মনে হল, যেন ঝড়ের পর সে কোন শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছে। শহর শান্ত কিন্তু যেন শ্রান্ত। সন্ধ্যার সমারোহ নাই, পথ প্রায় জন-প্রাণী শূন্য। যে দুই একজন ত্রস্তপদে যাতায়াত করছিল তারাও যেন ভীত, তারা যেন ক্ষিপ্রগতিতে আশ্রয়ের অন্বেষণে আত্মহারা। নীলু যেন চমকে উঠল। নীলাকে সঙ্গে করে নীলু একটি হোটেলে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল কিন্তু সেখানে হোটেলের মালিক স্থান দিতে স্বীকার করল না।

"জায়গা নেই ?—কেন বলুন তো ?"

"তা বলতে পারব না বাবু। সময় ভাল নয় বাবু, লোকজন সব পালিয়েছে।"

"কেন বলুন তো ? সময় কিসের খারাপ ? সহরে কী মড়ক লেগেছে ?"

নীলুর কথায় হোটেলের মালিক তার দিকে বোকার মত তাকাল, সন্দেহের দৃষ্টি, আশ্চর্য্যের ইশারা। নীলুর চেহারার

দিকে তাকিয়ে তার সন্দেহ যেন আরও দৃঢ় হল, সে বেশী কথা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে না করে তাদের মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে ঘরের দ্বার বন্ধ করে দিল।

নীলু যেন আবার আশ্রয়হীন হল। বাস-কেন্দ্রে গিয়া খবর নিয়ে জানল, সে রাত্রে কোন বাস মাগুরার দিকে রওনা হবে না। পরদিন সকালে একখানা বাস ছাড়তে পারে তবে তারও কোন বিশেষ স্থিরতা নাই। নীলু সেখানেও শুনল যে, সময় বড় খারাপ।

"তবে উপায় ?"—এতক্ষণে নীলা প্রশ্ন করল।

"উপায় একটা হবেই। চল, একবার নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি কোন নৌকা পাই কিনা ? আজ তো অনেকের শহরে বাজার করতে আসার কথা।"

"যদি নৌকাও না পাও সেখানে ?"

"তা হলে স্টেশনে এসে আশ্রয় নেব। রাত কাটিয়ে পরের দিন দেখা যাবে কী উপায় হয়।"

দু'জনে ঘাটে গেল। এমন দিনে নানা গ্রামের নৌকা ঘাটটিকে ঘিরে থাকত, কোলাহল আর নৌকার দল নবগঙ্গার মরা বুকেও জোয়ার এনে দিত, জলের বুকে শত শত আলোর প্রতিচ্ছবি পড়ত। সেদিন সে দৃশ্যের কোন স্পর্শও নাই। কয়েকদিন থেকেই নৌকাগুলি যেন অন্ধকারে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছিল। নীলু দু-একটি নৌকাকে তার গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করলে কোন মাঝি উত্তর দিল, কেও বা উত্তর দিবার প্রয়োজনও মনে করল না। সকলেরই কণ্ঠস্বরে যেন একটা বিপদগ্রস্ত সন্দেহ ভাব। শেষ চেষ্টা। নীলু একটা নৌকার কাছে এসে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করল—

"ওগো, এ নৌকা কোন্ গাঁয়ে যাবে ? আমায় একটু বাবুর ঘাটে নামিয়ে দেবে ? যা ভাড়া চাও দেব।"

নৌকার ভিতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল—"বাবুঘাটে কোন বাড়ীতে যাবে জিজ্ঞেস করতো নবীন!—হাল ধরে পারাপারের নাবিক নবীন নীলুকে প্রশ্ন করল।

"বাবুর বাড়ীতেই যাব গো। তোমরা শুধু ঘাটে নামিয়ে দিও তাহলেই হবে।"

"চেনাচেনা লাগে যেন গলাটা! দাঁড়াও বাবু, মুখ দেখি আগে, সময় বড় খারাপ! ভিতর থেকে একটি আলো হাতে মাঝি এসে নীলুর মুখের উপর আলোটা তুলে ধরল।

"ঠিক যা ভেবেছিলুম। আমার রাজাবাবু! আলোটা ছই-এর গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে সীতানাথ মাঝি নীলুকে প্রণাম করেই জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কেঁদে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে গেল নীলু।—হেঁয়ালির মত মনে হল তার কাছে সব দৃশ্যটুকু।

"মাঝি-কা—তুমি! যাক্, ভগবান রক্ষে করলেন! কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন মাঝি-কা?"

"ও কিছু নয় রাজাবাবু। কত দিন পরে তোমায় দেখলেম, তাই। এসো, উঠে এসো ভিতরে। উনি কে সঙ্গে! আমাদের বৌ-রাণী?"

"হাঁ, মাঝি-কা"—অর্থহীন উত্তর দিল নীলু। সীতানাথ তাড়াতাড়ি নীলাকে প্রণাম করে করযোড়ে বলল—

"বৌ-রাণী, গেঁয়ো লোক আমি। দোষ নিও না মা। এ তোমারই নাও, উঠে এসো। সীতেনাথ তোমার ছেলে মা, দোষ নিও না।"

দু'জনে এসে আশ্রয় নিল নৌকার ছই-এর নীচে—তৃপ্তির আশ্রয়। সীতানাথ নবীনকে বলল, বাজার থেকে কিছু খাবার আর দু গেলাশ চা নিয়ে আয়।

"ভাল খাবার আনবি। আর দেখ, হিন্দুর দোকান থেকে নিবি সময় বড় খারাপ।

"মাঝি-কা, এসব কেন করছ! আমাদের খাওয়ার কোনই দরকার নেই।"

"সে হয় না রাজাবাবু। সীতেনাথের ঘরে এলে, না খেয়ে থাকবে! সীতেনাথ মরেনি এখনো বাবু! শিগগির যা নবনে, নাও ছাড়তে বেশী দেরী করব না। সময় যা পড়েছে!"

কিছুক্ষণ পরে সীতানাথের নৌকা নদীর বুকে এগিয়ে চলল গ্রামের দিকে। অন্ধকার রাত্রি। নবগঙ্গার বুকে শুধু নৌকার ছপ্ ছপ শব্দ, জোনাকির আলো পথ দেখিয়ে চলেছে। সীতানাথের নৌকার পশ্চাতে দু-চার খানা পরিচিত নৌকা এগিয়ে আসছে স্তব্ধ রাত্রির বুকে ছপ্ছপ্ শব্দ তুলে। মাঝে মাঝে কঁ্যা কঁ্যা করে নদীর পাখীগুলো এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য একটি বাঁশের মাথায় আশ্রয় নিচ্ছিল। তীর ঘেঁষে নৌকাগুলো চলেছে ধীর-মন্থর গতিতে। মাঝে মাঝে কিনারার জল ঘিরে রেখেছে বাঁশের কাঠা দিয়ে। তার বুকে মাঝে মাঝে মাছ লাফিয়ে উঠছে। মাছ দেখা যায় না, শুধু তার পতনের শব্দ শোনা যায়। কাঠার কোন অংশ কাটা, নৌকাকে পার করবার জন্য। পার হবার সময় বাঁশের সঙ্গে নৌকার তলদেশের ঘর্ষণের একটা বিচিত্র শব্দ হয়। কাঠায় কাঠায় লোক আছে মাছ পাহারা দেবার জন্য। বেষ্টিত জলের বুকে একটি ছোট নৌকায় পাহারাদারদের আশ্রয়। কোন নৌকা বলন যদি কাঠার ভিতর দিয়া যায় তবে পাহারাদার নৌকা থেকে সজাগ প্রশ্ন ওঠে—

"কোন গাঁ গো?"—প্রশ্নের উত্তরে পথিক-নৌকা তার নির্দ্দিষ্ট গ্রামের নাম বলে। এমন কত কাঠা, প্রতি কাঠাতেই প্রশ্ন হয়, প্রতি কাঠাতেই উত্তর দিতে হয়। প্রথম কাঠার উপর সীতানাথের নৌকা উঠতেই তার তলদেশের সঙ্গে বাঁশের ঘর্ষণের বিচিত্র শব্দে নীলা চমকে উঠল।

"ওটা কিসের শব্দ। ডুবল নাকি?"—নীলা হঠাৎ নীলুকে জড়িয়ে ধরেই চকিতে ছেড়ে দেয়।

"না বউরাণী, সীতেনাথের নৌকা ডোবে না। একদিন হয়ত ভরাডুবি হবে কিন্তু এমন ভাবে ডুববে না। ওটা বাঁশের শব্দ।

"কোন্ গাঁ গো?"—পাহারাদার-নৌকা থেকে প্রশ্ন ওঠে।

"বাবুর ঘাট—সীতেনাথের নাও!"—সীতানাথ উত্তর দেয়।

"সর্দ্দার! আদাপ! এক ছিলিম তামুক খেয়ে যাও।"

"আদাপ। ইব্রাম নাকি! সময় নেই ভাই। অন্য দিন হবে!" সীতানাথ নৌকার গতি বাড়িয়ে দিয়ে পার হয়ে গেল কাঠাটা। নবনে, সম্‌ঝে বুঝে কাঠা পার হবি রাতে—সময় বড় খারাপ। যে-সে কাঠায় নাও দাঁড় করাসনে যেন!

"তুমি আমাদের বাড়ীর খবর বললে না মাঝি-কা। কত বার জিজ্ঞাসা করলাম।

বাড়ীর খবর! সব ভাল রাজাবাবু। তোমরা এখন ঘুমোও দেখি, ভোর রাতে পৌঁছে যাব। বউরাণী শুয়ে পড়। নবনে ওদিকের পর্দ্দাটা ফেলে দে রে। য়্যাঁ, নবীন হাল ধরে সে দিকের পর্দ্দা ফেলে দিল। সীতানাথ বৈঠা বেয়ে চলেছে, তার দিকের পর্দ্দাটাও সে ফেলে দিল। সীতানাথ বুদ্ধিমান, তাই পর্দ্দার আড়াল করে দিল তার রাজাবাবু আর বউরাণীকে। ছই-এর ভিতরে নীলাকে শুইয়ে দিয়ে নীলু ছই-এ পিঠ দিয়ে বসে থাকল। দু-জনের বসার স্থান থাকলেও শোবার স্থান ছিল না, শোওয়াও যায় না, শালীনতায় বাধে।

নৌকার গতির ছন্দে ক্লান্ত নীলা ঘুমিয়ে পড়ল। আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে নীলুও ঘুমিয়ে পড়ল নৌকার ছই-এ মাথা রেখে। কত দিনের ক্লান্তির পর শান্তির নিদ্রা!

অনেকক্ষণ পরে নীলুর যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে উঁকি

দিয়ে দেখল বাইরের পৃথিবীর অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে, আকাশের বুকে তারার সংখ্যা কমে এসেছে, জোনাকির আলো নিভে গিয়েছে। আঃ! কী সুন্দর পৃথিবী! নীলার দিকে তাকিয়ে দেখল, তখনও সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, শান্ত শ্রীমুখে তার যেন কত শান্তির স্মৃতি। নীলু বাইরে এসে সীতানাথের কাছে বসল, সীতানাথ অকাতরে দাঁড় টেনে চলেছে।

"আমরা এসে গেছি মাঝি-কা। ঐ দেখ ঝাউ গাছ। গাছটা ঠিক তেমনি আছে, কত পরিচিত গাছ আমাদের। ও যেন ইশারা ক'রে ডাকছে আমাদের মাঝি-কা! বাবা, বড়-মা আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবেন কিন্তু—"

হঠাৎ নীলার কথা মনে পড়ে গেল নীলুর। তার কী পরিচয় দেবে সে? বাবা কী মনে করবেন? পিতার গুরু-গম্ভীর মুখচ্ছবি নীলুকে চকিত করে তুলল। "মাঝি-কা, তুমি কিন্তু আমাদের একেবারে ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিও—" সীতানাথকেই তখন একমাত্র ভরসা বলে মনে হল। একি! মাঝি-কা, তুমি কাঁদছ কেন মাঝি-কা? কী হয়েছে, শিগ্‌গির বল, কী হয়েছে?" সীতানাথকে ঝাঁকিয়ে দিল নীলু, সীতানাথ বৈঠা ছেড়ে জড়িয়ে ধরল রাজাবাবুকে, কেঁদে উঠল শিশুর মত। নৌকার গতি শুধু স্রোতের উপর নির্ভর করল, নবীনের হালই একমাত্র ভরসা তখন।

কাহিনীটি অতি ক্ষুদ্র কিন্তু সম্পূর্ণ। অতর্কিত আক্রমণ হয় জমিদার বাড়ীর উপর এক মধ্য রাত্রে। নিঃশেষ হয়ে যায় যাদব চক্রবর্ত্তীর সংসার। প্রবল প্রতাপ যাদব চক্রবর্ত্তী, দুই রাণী, মথুর, চাকর, দাসী সকলের দেহ একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ে জমিদারের অন্তর্প্রাঙ্গণে। ক্ষুদ্র কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণ।

সীতানাথের নৌকা লাগল বাবুঘাটের পাষাণ সোপানের কাছে

এসে। ঘাটের উপরের ফটকটির মাথায় একটি শকুন নদীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে স্থিরভাবে বসে ছিল। নৌকা থেকে নীলু ও নীলাকে নামতে দেখে উড়ে গেল শ্মশানের দিকে। পাখার একটা বিশ্রী শব্দে চমকে উঠল নীলু। এই যেন তার অভ্যর্থনা। স্থির ও ধীর পদক্ষেপে নীলু ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল উপরে, পিছনে শান্ত পদক্ষেপে নীলা, সকলের পশ্চাতে অশান্ত পদক্ষেপে সীতানাথ। নিঃশব্দে সকলে উঠে এল ঘাটের চত্বরের উপর। নীলু একবার তাকাল সোজা লাল পথটির দিকে। পথের কাঁকরগুলো যেন আরো লাল হয়েছে। বাবুঘাটের পথটিকে কে যেন রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। ঘাট থেকেই দেখা গেল জমিদার বাড়ীর পূজার মণ্ডপ, দেখা গেল যাদব চক্রবর্ত্তীর বহিপ্রাঙ্গণের বিশিষ্ট অংশ। নীলু লক্ষ্য করে দেখল বারান্দায় তার বাবার আরাম কেদারাটির অনুপস্থিতি। যাদব চক্রবর্ত্তী যখন সেই আরাম কেদারায় বসে থাকতেন তখন তাঁকে ঘাটের সিঁড়ি থেকে দেখা যেত। স্তব্ধ হয়ে এল নীলুর পদক্ষেপ। সীতানাথ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

"রাজাবাবু! তোমাকে বুদ্ধি দেবার মত বুদ্ধি এই মুখ্যু ছেলের নাই। তুমি নিজে না সামলালে কে সামলাবে রাজাবাবু?"

সীতানাথের কথার অবশিষ্টাংশ রোধ করল তার অশ্রুধারা। নীলা একবার তার একবার নীলুর মুখের দিকে তাকাল।

"বউরাণী!—"

সীতানাথের ডাকে চমকে উঠল নীলা। এ কী আহ্বান! এ ডাকে সাড়া দেবার অধিকার নীলার নাই অথচ এই মহা দুঃসময়ে সাড়া না দিলেও তার চলে না। নীলার বিপদের সময়ে মহানগরীতে একমাত্র নীলুই সাড়া দিয়েছিল।

"বউরাণী—!" আবার সেই আহ্বান, সেই ডাক, যে ডাকে দূরকে নিকট করে, পরকে আপন করে।

"বউরাণী, বাবুর বংশের অনেকদিনের গোলাম আমি—এ সময়ে তুমি যদি হাল না ধর মা, তবে সামলান দায় হবে। এখন মাঝির কাজ নয়, এখন আমার মা'র কাজ। ছেলে তোমার পায়ে পড়ছে মা, এবার তুমি হাল ধর। নয় তো ভরা ডুবি হবে!"

সীতানাথের কথা নীলার অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করল, সুপ্তোত্থিত করল যেন নিদ্রিতা নারীকে, শ্বাশতী জননীকে। নীলা এসে নীলুর পাশে দাঁড়াল; তার হাত ধরল নিজের স্থির মুষ্টির মধ্যে।

এগিয়ে চলল দুজনে পাশাপাশি। নীলু ও নীলা—পুরুষ ও নারী—পুরুষ ও প্রকৃতি—ধ্বংস ও সৃষ্টি!

নিঝুম হয়ে পড়েছিল পেট-কাটা দালান। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত দরজায় তালা বন্ধ। প্রহরীর ঘণ্টা বাজাবার ঘণ্টাটি তখনও ঝুলছে কিন্তু তার হাতুড়ীটি তার পাশে ঝোলান নাই। বাড়ীর সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের অবস্থা ভিতরের অবস্থার কিছু ইঙ্গিত দেয়। শুষ্কপাতা ও খড়ে প্রাঙ্গণটি যেন জরাজীর্ণ হয়ে আছে। জমিদার থাকতে এই প্রাঙ্গণটি চকচক করত। বাড়ীর দু-পাশের ফুলের বাগানের বেড়া ভেঙ্গে এগিয়ে পড়েছে দু-পাশে—ক্ষত-বিক্ষত তার ছোট বড় গাছগুলি।

বহির্দালানের বারান্দায় ছড়িয়ে আছে তখনও আসবাবের টুকরাগুলো। যাদব চক্রবর্ত্তীর আরাম কেদারাটি এককোণে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তার হাতল দুটি নাই, একটি পা নাই বলে সে-দিকেই কাৎ হয়ে গেছে সে। জমিদারই যেন একদিনে পঙ্গু হয়ে কাৎ হয়ে পড়েছে। অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ল যে, কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ জমিদার বাড়ী প্রদক্ষিণ করে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

"মাঝি-কা—পুলিশ!" ভীত দৃষ্টিতে নীলু তাকাল সীতানাথের দিকে। সীতানাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একজন পুলিশকে কী যেন বলল। দীপ্ত কণ্ঠে পুলিশকে বলতে শোনা গেল—

"হুকুম নেহি হ্যায়। কোই অন্দর মে নেহি যা সকতা। কোই নেহি।—আরে চলো, চলো—হাম জমিদার কা লেড়কাকো নেহি পহচানতা হ্যায়—

"পুলিশটি একবার নীলার দিকে তাকিয়ে, নিজের কড়া গোঁফটিতে একটা পাক দিয়ে আবার পদচালনা করতে লাগল।

"তোমরা একটু বসো বউরাণী। আমি থানা থেকে দারোগা-বাবুকে এক্ষুণি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব—হাঁ—হাঁ—মাটিতে নয়—মাটিতে নয়" নীলু তখন মাটিতে বসে পড়েছে। সীতানাথ নিজের গায়ের চাদরটা পেতে দিল মাটিতে। "তোমার পায়ে পড়ি রাজাবাবু, এটার ওপর বস।" এও দেখতে হ'ল এই পোড়া চোখে—এ দেখবার আগে চোখ দুটো আমার অন্ধ হয়ে গেল না কেন ?

থানার দারোগা এসে নীলু ও নীলাকে অন্দরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পুলিশকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা জমিদারের পুত্র ও পুত্রবধূ—তারা যেন যাতায়াতের অবাধ অনুমতি পায়। পুলিশের জমাদার নীলুকে সেলাম করে তার স্বীকৃতির পরিচয় দিল।

নীলা নীলুর হাত ধরে ভিতরে প্রবেশ করল। প্রথমেই জমিদারের খাস কামরা। তার চেহারা দেখে মনে হল, কে যেন তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে সে ঘরে। আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দ্দিকে। মাথার উপরেব ঝাড় বাতির চিমনি ও রঙ্গীণ কাচের ঝালরের টুকরায় সমস্ত ঘরটা পরিপূর্ণ। বৃহৎ আলমারীর দর্পণটি শতধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকে নীলু নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলে বিচিত্র ও বিভিন্নরূপে। নীলু দেখতে পেল যেন চক্রবর্ত্তী-বংশের আমূল প্রতিচ্ছবি শতধা হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। নীলু দেখতে পেল জমিদারীর ভবিষ্যৎ, দেখতে পেল বাংলার ভবিষ্যৎ। এইভাবে কী সব শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে ? যাদব চক্রবর্ত্তীর

দুগ্ধফেননিভ শয্যা তখনও অবিন্যস্ত হয়ে আছে। মশারিটি তোলা হয়নি তখনও, শয্যার স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য রক্তের দাগ। শিশুর মত লুটিয়ে পড়ল নীলু সেই শয্যার উপর। সীতানাথের ইঙ্গিতে নীলা তাকে অন্দরে নিয়ে গেল। অন্দর ও বাহিরের একই দশা, একই ছবি!

"আমাদের তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। এবার আপনারা বাড়ী-ঘর আবার গুছিয়ে নিতে পারেন। তবে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ পাহারা আরও কয়েকদিন থাকবে।" দারোগা নীলুকে জানাল—"বাবু আমাকে ছেলের মত ভালবাসতেন, আমি দৌড়ে আসতে আসতে সব শেষ করে ফেলেছিল শয়তানরা। প্রাণ বাঁচাতে পারলাম না। আর একটু আগে আসতে পারলে"—দারোগারও কণ্ঠ রোধ হল হয়তো বাষ্পেই! নতুন যুবক দারোগা, তখনও মানুষই ছিল।

"আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নেব দারোগা বাবু। আপনার কৃপা ভুলবার নয়—" নীলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

"আবার সব সাজিয়ে তুলব—না নীলা?" অর্থহীন দৃষ্টি দিয়ে নীলু প্রশ্ন করল।

নীলা জমিদার বাড়ীকে আবার গুছিয়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হল। সে আবার সাজিয়ে তোলার ভার নিল চক্রবর্ত্তী বংশকে। সে প্রথমেই শতদীর্ণ দর্পণটিকে সরিয়ে ফেলল—যাতে দর্শকের প্রতিবিম্বকে বিকৃত না করে, শত টুকরো না করে। পুরাতনের বুকে নূতনের প্রতিবিম্বের আর প্রয়োজন নাই।

শেষ